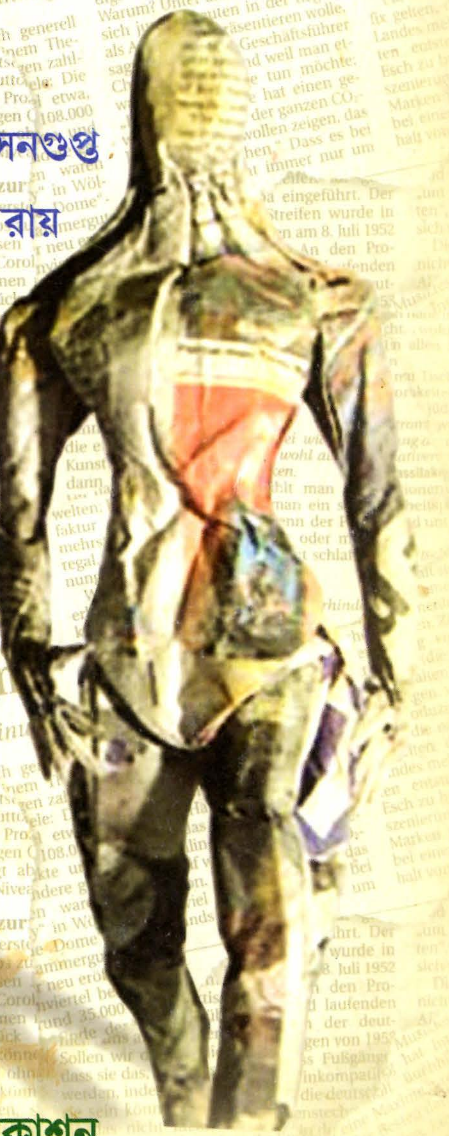
সত্যের মুখোমুখি

সন্ত্রাস, অনুপ্রবেশ ও অন্য প্রসঙ্গ

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

মোহিত রায়



শঙ্খনাদ প্রকাশন

সত্যের মুখোমুখি

সন্ত্রাস, অনুপ্রবেশ ও অন্য প্রসঙ্গ

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

মোহিত রায়

শঙ্খনাদ প্রকাশন

প্রকাশক :

শঙ্খনাদ প্রকাশন

৩৬-এ, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট

কলকাতা - ৭০০ ০০৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

বর্তমান

বর্তমান প্রাইভেট লিমিটেড

৬, জে. বি. এস. হ্যালডেন অ্যাভিনিউ

কলকাতা-৭০০১০৫

প্রকাশকাল :

প্রথম মুদ্রণ : কার্ত্তিক - ১৪২১

মুদ্রক :

এস. কে. এন্টারপ্রাইজ

কলকাতা

সহযোগ রাশি : পনেরো টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা ঠিক নয়, সত্য স্বপ্রকাশ, সত্য শাশ্বত, পরম কল্যাণকারী। এই সত্যকে কোন কিছুর মোহেই ত্যাগ করা উচিত নয়। কোন কিছু মানে? অর্থ, ক্ষমতা, জাগতিক সুখ, জনপ্রিয়তা, মহৎ ভাবমূর্তি— কিছুর জন্যই নয়। কিন্তু আমাদের সমাজে যারা সিদ্ধান্ত নেন, জনমত তৈরি করেন, সমাজ-সমকালের ছবি তুলে ধরেন সংবাদ মাধ্যমে, তাঁরা প্রায়ই এই সহজ স্পষ্ট কথাটা ভুলে যান। কখনো ব্যক্তি স্বার্থে, কখনো দলগত প্রাপ্তির জন্য, কখনো বা নিজেকে কৃত্রিম ভাবে মহান প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টায় সত্য ভাষণ থেকে বিরত হন। দিনের আলোর মতো ঘটনা চোখের সামনে ঘটে যাওয়ার পরেও না দেখার ভান করেন, সত্যি কথা বলার সৎ সাহসের অভাবকে ঢাকার চেষ্টা করেন মহৎ হবার ভান ক'রে। শেষে হয়ত প্রবল মরুঝড়ের আগমনে মরুভূমির উটপাখির মত বালিতে মুখ লুকোবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, সমাজের উপর আছড়ে পড়া দুর্যোগের ঝড় সবকিছুর সঙ্গে তাঁকেও উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

দেশের প্রবুদ্ধ সমাজের এই সত্যকথা বলার সাহসের অভাবে সমগ্র দেশবাসীর এই দুর্দশা। স্বাধীনতার এত বছর পরেও দেশের সব মানুষের এক রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের কথা, সব শিশুর জন্য এক শিক্ষার কথা বলতে আমাদের ইতস্তত করতে হয়। সন্ত্রাস, মৌলবাদী জেহাদ বা সর্বস্তরে ছড়িয়ে থাকা দুর্নীতির কথা বলতে ভাবতে হয় সাত সতেরো কথা। এসবের জন্য সমাজের অসৎ শক্তির সক্রিয়তা যত না দায়ী তার থেকেও বেশি দায়ী বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের নিষ্ক্রিয়তা। কলকাতার রাজপথে মুখঢাকা ব্যানার নিয়ে মিছিল হয় প্যালেস্তাইন কিংবা কিউবায় নিপীড়িতদের সমর্থনে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সীমান্তের ওপারেই হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপরে অমানুষিক অত্যাচারের পরেও, মায়ের সামনে মেয়ে, মেয়ের সামনে মা ধর্ষিতা হলেও এ বাংলার বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীলরা প্রতিবাদ করেন না। জেহাদি মৌলবাদের

ভয়াবহতার সামনে নিজেদের অক্ষমতা লুকোতে মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন।। বিগত কয়েক দশকে এটাই পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বজ্জনেদের দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু বাস্তব রূপ।

এর মধ্যে ব্যতিক্রমী বলিষ্ঠ দুই স্তম্ভ লেখকের সাম্প্রতিক লেখার সংকলন এই পুস্তিকা। কাশ্মীর প্রসঙ্গ থেকে বাংলাদেশী উদ্বাস্তু—সব কিছুতেই নির্ভীক সত্যের উপস্থাপন হয়েছে এক হৃদয়বান মানবিক দৃষ্টি থেকে।

রন্তিদেব সেনগুপ্ত সাংবাদিকতার জগতে এক প্রতিষ্ঠিত নাম। বিগত দুই দশকের বেশি সময় ধরে তাঁর লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলার সংবাদ সাহিত্য। বর্তমান পত্রিকায় তাঁর নিয়মিত কলামে প্রকাশিত ১০টি লেখা আছে এই সংকলনে।

মোহিত রায় অধ্যাপক, পরিবেশবিদ, বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালে ঘটে চলা সংখ্যালঘু নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক উজ্জ্বল মুখ। দুই বাংলাতেই কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাতে বারবার ঝলসে উঠেছে তাঁর লেখনী। 'বর্তমান' পত্রিকাতেই প্রকাশিত এই লেখকের দুটি লেখা এখানে রাখা হয়েছে। নির্ভীকভাবে সত্যকথনের এই মহতি প্রয়াস আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছোক এটাই এই পুস্তিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। এই লেখাগুলির জন্য 'বর্তমান' পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

সূচিপত্র

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

মোহিত রায়

ব্যাপক অর্থে হিন্দুত্ব একটি সংস্কৃতি, এটি স্বীকার করতে বাধা কোথায়?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

We are Hindus. I do not use the word Hindu in any bad sense at all, nor do I agree with those that think there is any bad meaning in it. Upon us depends whether the name Hindu will stand for everything that is glorious, everything that is spiritual. If at present the word Hindu means anything bad, never mind; by our action let us be ready to show that this is the highest word that any language can invent.

Swami Vivekananda [Collected works, vol-3]

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবতের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। মোহন ভাগবত সম্প্রতি বলেছেন, হিন্দুত্বকে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আচরণ বা হিন্দুদের শুধুমাত্র একটি ধর্মগোষ্ঠীর মানুষ ভাবলে ভুল হবে। হিন্দুত্ব প্রকৃত অর্থে একটি সংস্কৃতি। এবং, এটিই ভারতের মূল সংস্কৃতি। সে অর্থে ভারতীয় সংস্কৃতিতে লালিত প্রতিটি ভারতীয়ই হিন্দু। এই হিন্দু পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সে ধর্মাচরণে স্বতন্ত্র হতেই পারে। ভাগবতের এই ব্যাখ্যাটি নিয়েই যাবতীয় বিতর্কের সূত্রপাত। এদেশের তথাকথিত সেকুলারপন্থীরা ভাগবতের এই বক্তব্যের ভিতর 'অন্য অর্থ' খুঁজে পাচ্ছেন। তাঁরা মনে করছেন, এই ধরনের কথাবার্তা বলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ প্রধান সাম্প্রদায়িকতায় উৎসাহ জোগাচ্ছেন এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব পোষণ করছেন না। মোহন ভাগবত যে মন্তব্যটি করেছেন এবং হিন্দুত্বের যে ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাখ্যাটি নিয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনারও প্রয়োজন অছে। মোহন ভাগবত বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে শুধু কাঠগড়ায় দাঁড় করানোই একমাত্র উদ্দেশ্য না হয়ে এনিয়ে একটি স্বচ্ছ আলোচনা যদি করা যায়, তাহলেই পরিষ্কার হবে—মোহন ভাগবতের মন্তব্যটি সাম্প্রদায়িক দোষে আদৌ দুষ্ট কি না।

হিন্দুত্বকে একটি সংস্কৃতি বলায় যাঁরা মোহন ভাগবতের সমালোচনা করেছেন এবং ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে কান্না জুড়ে দিয়েছেন, প্রথমেই তাঁদের জ্ঞাতার্থে কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী মহম্মদ করিম চাগলার একটি বক্তব্য তুলে দিই। করিম চাগলা বলেছিলেন—'I am Muslim by religion and

Hindu by race.' [Roses in December—Chagla]। অর্থাৎ, আমি ধর্মগতভাবে মুসলমান, কিন্তু জাতিতে হিন্দু। অর্থাৎ হিন্দুত্বের যে একটি ব্যাপক অর্থ আছে, তার সীমাবদ্ধতা যে শুধু কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর আবদ্ধ নয়—তা চাগলা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যে কারণেই ধর্মাচরণে মুসলমান হয়েও হিন্দুসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেকে স্বীকার করতে তাঁর বাধেনি। হিন্দুত্ব এবং হিন্দু প্রসঙ্গটি নিয়ে যে কোনও আলোচনার শুরুতেই এটা মনে রাখা ভালো যে, ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে হিন্দুত্বের মূলগত একটি পার্থক্য রয়েছে। ওই দুটি ধর্মের মতো নির্দিষ্ট কোনও ধর্মগ্রন্থের অনুশাসনে হিন্দুত্ব কাউকে বেঁধে রাখেনি। বরং যে বেদান্ত-উপনিষদকে হিন্দুত্বের মূল ভিত্তি হিসাবে মনে করা হয়, তা প্রকৃতঅর্থে একটি জীবনদর্শন। এটি মনে রাখলে হিন্দুত্ব সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণা মনে স্থান পায় না। এও মনে রাখতে হবে—হিন্দুত্ব শব্দের অর্থ শুধু উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আবার, হিন্দুত্ব শব্দটি যখন উপাসনা পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখনও তার দু-প্রকার অর্থ করা হয়—একটি ব্যাপক রূপে, একটি সীমিত রূপে। ব্যাপক রূপে যখন এই অর্থ করা হয়—তখন তার ভিতরে ভারতে সৃষ্ট সমস্ত মত এবং সম্প্রদায়—যেমন বৌদ্ধ, শিখ, জৈন এর অন্তর্ভুক্ত হয়। হিন্দু কোড বিলে 'হিন্দু' শব্দের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—তা এই ব্যাপক অর্থে। আবার সীমিত রূপে যখন 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহার করা হয়—তখন বৌদ্ধ, শিখ, জৈন এরা তার আওতায় আসে না। আমাদের দেশের সেকুলারপন্থীদের চালাকি এটাই যে, হিন্দুত্বের এই সংকীর্ণ অর্থটিকেই তাঁরা বার বার তুলে ধরেন। তুলে ধরেন এই কারণেই যে, এতে করে হিন্দুত্বকে হেয় করা এবং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা—দুয়েরই সুবিধা হয়। হিন্দুদর্শনের অর্থটি যে ব্যাপক—সেকথা একবারও মুখ ফুটে বলেন না এই সেকুলারপন্থীরা।

এই হিন্দুত্বকে 'ধর্ম' অর্থে ব্যবহার করলেও এর ব্যাপ্তিতে কিন্তু সমগ্র মানবজাতি আসে। কেননা, বেদান্ত এবং উপনিষদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা হিন্দুধর্ম নির্দিষ্ট উপাসনা পদ্ধতির বদলে ব্যাপক অর্থে মানবধর্মের কথাই বলে। এক্ষেত্রে অক্সফোর্ড অভিধানে ধর্ম আর রিলিজিয়নের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা উল্লেখ করা চলে। অক্সফোর্ড অভিধান বলছে 'Dharma' হল 'the eternal law of the Universe'। আর 'religion' হল 'Particular System of faith and worship।' কাজে কাজেই কেউ যদি বলে থাকেন, তিনি মুসলমান হন বা খ্রিস্টান, তবু হিন্দু সংস্কৃতি এবং দর্শনের অনুসারী—তাঁকে ভুল কিন্তু বলা যায় না। সেকুলারপন্থীদের সমস্যা হচ্ছে— হিন্দুত্বের এই ব্যাপ্তিকে তাঁরা কখনও অনুধাবন করার চেষ্টা করেননি, করেনও না। এঁরা হিন্দুত্ব সম্পর্কে এমন একটি বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করেন, যে ব্যাখ্যা হিন্দুত্বকে নিছক সাম্প্রদায়িক, সংস্কারাচ্ছন্ন একটি ভাবনা হিসাবেই উপস্থিত করে সর্বত্র। এতে হিন্দুত্বের মহত্ত্ব কতটা খাটো হয় জানি না, তবে, সেকুলারপন্থীদের অর্ধশিক্ষা এবং উপর চালাকিটি ধরা পড়ে যায়।

আসুন উর্দু কবি ইকবালের কথায়। ইকবাল সেকুলারপন্থীদের কাছে যথেষ্ট মান্যতা

পান। ইকবাল তাঁর বিখ্যাত সংগীত ‘সারে জঁহা সে আচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা’—তে একটি পঙক্তি লিখেছিলেন—‘হিন্দি হ্যায় হম ওয়াতন হ্যায় হিন্দোস্তাঁ হমারা’। ইকবাল নিশ্চয়ই হিন্দি হ্যায় হ্ম বলতে শুধুমাত্র হিন্দিভাষী বা হিন্দু উপাসনা পদ্ধতিতে বিশ্বাসীদের কথা বলেননি। ইকবাল এখানে ‘হিন্দি’ শব্দটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছেন। ইকবাল বোঝাতে চেয়েছেন, ভারতে বসবাসকারী সমগ্র জনগোষ্ঠীকেই। অর্থাৎ ইকবালও স্বীকার করেছেন, ভারতীয়রা, তাদের ধর্মগত পরিচয় যার যা'ই হোক-না-কেন, সংস্কৃতিগত পরিচয়ে হিন্দু। হিন্দুত্বকে শুধু উপাসনা পদ্ধতি দিয়ে বিচার না করে ব্যাপক অর্থে বিচার করলে কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হবে না, হিন্দুত্ব যে-হিন্দুর কথা বলছে, তা সংস্কৃতিসূচক এবং রাষ্ট্রীয়তাসূচক। এই সংস্কৃতিসূচক এবং রাষ্ট্রীয়তাসূচক হিন্দু পরিচয়টি মেনে নেওয়ার অর্থ এই নয় যে, খ্রিস্টান বা মুসলমানদের উপর হিন্দু উপাসনা পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়া হবে। আবার এই হিন্দুসংস্কৃতির অন্তর্গত হলে কারও প্রাদেশিক পরিচয়, যেমন বাঙালি, মারাঠি বা গুজরাতি বিপন্ন হয়ে পড়বে—এমন ভাবাটাও ঠিক নয়।

সেকুলারপন্থীরা আর একটি কথাও বলে থাকেন। তাঁরা বলেন, ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী রাষ্ট্রীয়তাসূচক শব্দ। কিন্তু হিন্দু তা নয়। সেকুলারপন্থীদের এই বক্তব্য কতখানি গ্রহণযোগ্য তাও ভেবে দেখার দরকার আছে। হিন্দুস্থানী শব্দটি এসেছে হিন্দুস্থান থেকে। আর হিন্দুস্থান শব্দটি এসেছে হিন্দু থেকে। কাজেই হিন্দুস্থানী আর হিন্দু সমার্থক নয়—এমন বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, হিন্দুস্থান শব্দটির ভিতর হিন্দুর যে অর্থ নিহিত আছে, তা কিন্তু রাষ্ট্রীয়তাসূচক শব্দ। তার সঙ্গে উপাসনা পদ্ধতির কোনও সম্পর্ক নেই। এই প্রেক্ষিতে বিচার করলে কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, হিন্দুত্বকে ভারতের মূল সংস্কৃতি হিসাবেই স্বীকার করা হয়েছে সর্বত্র।

এবার প্রশ্ন উঠতেই পারে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত তাঁর বক্তব্যে হিন্দু শব্দের কোনও সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা করেছেন কি না? কোনওরকম সাম্প্রদায়িকতায় তিনি ইন্ধন জুগিয়েছেন কি না। মোহন ভাগবতের বক্তব্যটি যদি ঠিকমতো বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, হিন্দুত্বের ব্যাপক অর্থটির কথাই তিনি বলেছেন। হিন্দু শব্দটিকে তিনি সংস্কৃতিসূচক এবং রাষ্ট্রীয়তাসূচক শব্দ হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। হিন্দুত্বকে তিনি নিছক উপাসনা পদ্ধতির সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ রাখেন নি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান যদি হিন্দুত্বের উদার ব্যাখ্যাটির উপস্থাপন করতে চান—তাহলে আপত্তি কেন? আপত্তি কোথায়? এর অনেক আগেই তো ইকবালের মতো উর্দু কবিও হিন্দুত্বকে সংস্কৃতি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছেন তাঁর সংগীতে! ইকবালের বিরুদ্ধে কোনও সমালোচনা উঠেছিল বলে তো জানা নেই। তাহলে মোহন ভাগবতের বিরুদ্ধে এই বিরোধিতা কেন? সে কি কিছুটা না বুঝে? অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই? যদি ইচ্ছাকৃতভাবেই সমালোচনা শুরু করা হয়, তাহলে বলতেই হবে—সাম্প্রদায়িক বিভাজন আসলে কারা করতে চাইছেন—এখন তাও ভেবে দেখা দরকার।

সেকুলারপন্থীরা স্বীকার করুন, বা না করুন, এটি স্বীকৃত সত্য যে, মূল ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে কিন্তু বেদান্ত এবং উপনিষদ থেকে উদ্ভূত হিন্দুসংস্কৃতিকেই বোঝায়। বিদেশি শাসকদের সঙ্গে আসা ইসলাম বা খ্রিস্টীয় সংস্কৃতিকে বোঝায় না। এই হিন্দুসংস্কৃতিই হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সমাজ জীবনের মেরুদণ্ড। এবং এও মনে রাখা দরকার, বিভিন্ন সময়ে বিদেশি শাসকদের হাতে আক্রান্ত হয়েও ভারতের মাটি থেকে এই হিন্দুসংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়নি। তার কারণ, হিন্দুসংস্কৃতির শিকড়টি ভারতের গভীরে প্রোথিত। কাজেই ভারতের মূল সংস্কৃতি হিন্দুসংস্কৃতি এবং ধর্মগত পরিচয় যার যা'ই হোক-না-কেন, ভারতীয় হিসাবে এই হিন্দুসংস্কৃতিরই ফসল সবাই—একথা বলার ভিতর ভুল যেমন কিছু নেই, অন্যায়ও নেই।

লেখাটি শেষ করব, দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জ্ঞাপন করে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ নামক সংগঠনটিকে এদেশের সেকুলারপন্থীরা বরাবরই সাম্প্রদায়িক এবং অচ্ছুৎ মনে করে এসেছেন। অথচ দেশের দুই ভূতপূর্ব কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সম্পর্কে ধারণাটি ঠিক এরকম ছিল না। ১৯৬২-র চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের সহায়তায় যেভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এগিয়ে এসেছিল, তার স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৬৩-র প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে অংশ নিতে আহ্বান জানান নেহরু। নেহরুর সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সেবার প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কুচকাওয়াজে অংশ নিয়েছিল। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় দিল্লি পুলিশের উপর নিরাপত্তাজনিত কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় দিল্লি শহরে যান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের হাতে অর্পণ করেছিলেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর সৌদি আরব এবং কাজাকস্তানের দুটি বিমান আকাশে মুখোমুখি সংঘর্ষে ভেঙে পড়ে চাখরি-দাদরিতে। ওই দুর্ঘটনায় যে ৩১২ জন যাত্রী মারা যান তাঁরা সকলেই ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের। ওই ঘটনার পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কর্মীরা যেভাবে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধারের কাজ করেছিল তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি এম ইব্রাহিম, পি জি কুরিয়েন এবং হরিয়ানার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। এবং সৌদি আরবের সংবাদপত্র আল রিয়াদ লিখেছিল—রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ যে মুসলমান বিরোধী—এ ভুল ধারণা তাদের দূর হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই দু-একটি তথ্য মনে রাখাও অতীব জরুরি।

লেখাটি শুরু করেছি স্বামী বিবেকানন্দের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। শেষ করবও তাঁরই উদ্ধৃতিতে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— 'I am proud to call myself a Hindu' [Collected works, Vol-3]। তাঁর হিন্দু পরিচয়ে বিবেকানন্দ যখন গর্বিত ছিলেন, আমাদের গর্বিত হতে দ্বিধা কেন?

—বর্তমান পত্রিকা, ২৬শে আগস্ট ২০১৪

অহেতুক মুসলিম তোষণ বন্ধ না হলে ভারতে হিন্দুরাষ্ট্রের দাবি জোরদার হবে

অতি সম্প্রতি দেশের প্রধান মুসলিম ধর্মীয় সংগঠন জামাত-এ-উলেমা-ই-হিন্দের একটি গোষ্ঠীর প্রধান মেহমুদ মাদানি অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। মেহমুদ মাদানি বলেছেন, 'মুসলিমদের অযথা নরেন্দ্র মোদিকে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। কংগ্রেস চেষ্টা করছে মুসলিমদের মোদির ভয় দেখাতে। কিন্তু, মোদির ভয় দেখিয়ে মুসলিম ভোট পাওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। মুসলিম ভোট পেতে গেলে কংগ্রেসকে মুসলিম সমাজের উন্নতির চেষ্টা করতে হবে, যেটা তারা এতদিন করেনি। কেন্দ্রে কংগ্রেস এবং উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টি মুসলিমদের উন্নতি করতে, বা, তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।' ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মেহমুদ মাদানির এই কথাগুলির যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে তা অনস্বীকার্য। কিছুদিন আগেও কংগ্রেসের সঙ্গে সখ্য বজায় রেখে চলা মেহমুদ মাদানির এইসব কথাবার্তা যে বর্তমানে কংগ্রেসকেই অস্বস্তিতে ফেলবে বেশি—তা না বললেও চলে। বি জে পি'র পক্ষে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদি গুজরাত দাঙ্গার ছাপ গা থেকে তুলে মুসলিম মন জয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। মাদানির এই মন্তব্য লোকসভা নির্বাচনের আগে মোদিকেও উৎফুল্ল করবে সন্দেহ নেই। খুব শীঘ্রই পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তারপরই ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনগুলিতে ভালো ফল করতে গেলে মুসলিম ভোটের গরিষ্ঠাংশ নিজেদের দখলে রাখা সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধীর পক্ষে অতীব জরুরি। বিশেষ করে, দিল্লি, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে মুসলিম ভোট প্রায় পুরোটাই পেতে চায় কংগ্রেস। সোনিয়া এবং রাহুল জানেন, গরিষ্ঠাংশ মুসলিম ভোট যদি কংগ্রেসের ঝুলিতে না পড়ে, তাহলে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির মোকাবিলা করা তাঁদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে যাবে। কিন্তু মেহমুদ মাদানির এই বক্তব্যের পর ধরেই নেওয়া যায়, মুসলিম ভোটেও ভাগ হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। অসম্ভব মনে হলেও, মুসলিম সমাজের একাংশের মন জয়ে হয়তো মোদি সক্ষমই হয়েছেন। আর তা যদি হন তাহলে সোনিয়া-রাহুলের তৃতীয়বার ইউ পি এ সরকার গঠনের আশা নিরাশায় পরিণত হতে বাধ্য।

এ তো গেল মাদানির কথার রাজনৈতিক গুরুত্ব। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—তা শেষপর্যন্ত ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনেই বোঝা যাবে। নরেন্দ্র মোদি

কতখানি মুসলিম মন জয় করতে পারলেন, আদৌ পারলেন কি না—এসবই পরিষ্কার হবে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের পর। কিন্তু তার আগে এটুকু বলাই যায় যে, মেহমুদ মাদানি যেকথা ক'টি বলেছেন, শুধু ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, সামগ্রিকভাবে ভারতের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটেও কথাগুলি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তার চেয়েও বড় কথা—মাদানি একটি সত্য কথা সহজে বলেছেন, যা অনেকেই বলেন না, বা বলতে চান না। প্রথমেই একটি বিষয় মনে রাখা ভালো, ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলতে শুধুমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়কেই বোঝায় না। খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক—ইত্যাদি ধর্মমতাবলম্বী মানুষরাও কিন্তু সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিতরেই পড়েন। যদিও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলতে সাধারণভাবে আমরা মুসলিম সম্প্রদায়কেই বুঝি। আমাদের এরকম বোঝার পিছনেও কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক ইত্যাদি ধর্মমতাবলম্বীদের থেকেও সংখ্যালঘু হিসাবে মুসলিমরা অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়ে এসেছে সব রাজনৈতিক পক্ষ এবং সরকারের কাছ থেকেই। ফলে সংখ্যালঘু মানেই মুসলিম—এই ধারণাটিই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে বরাবর। অথচ জনগণনার হিসাবে কিন্তু দেখা যাবে খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ বা পারসিকদের থেকে সংখ্যায় মুসলিমরা বহুগুণ বেশি। শুধু তাই নয়, দেশের নির্বাচকমণ্ডলীতে তারা এখন রীতিমতো 'ডিসাইডিং ফ্যাক্টর।' দ্বিতীয়ত, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে। ফলে, তাদের ভিতরে সংকীর্ণতা এবং মৌলবাদী মানসিকতা দূর হয়েছে। দেশের মূলস্রোতের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার মানসিকতা অন্তত তাদের ভিতরে দেখা যায় না। দুর্ভাগ্য যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ এখনও আলোকপ্রাপ্ত হয়নি; হওয়ার আগ্রহও দেখায়নি তারা। বরং নানাবিধ সংকীর্ণতা এবং মৌলবাদকেই তারা অবলম্বন করেছে। তার থেকেও দুর্ভাগ্য, এই সম্প্রদায়ের একাংশ দেশের মূলস্রোতের সঙ্গে এখনও নিজেদের একাত্ম করে তুলতে পারেনি। এই অংশটি এখনও ভারতকে নিজের দেশ ভাবে না। তার বড় প্রমাণ, ভারত-পাক ক্রিকেট ম্যাচ থাকলেই দেশের বিভিন্ন অংশে ভারতীয় মুসলমিদের একাংশের পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে উল্লাসে মেতে ওঠায়। দুঃখজনক হলেও, এ-ও অস্বীকার করা যাবে না যে, হিন্দু সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলিম মনীষীদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কার্পণ্য না করলেও, মুসলিম সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভিতর এখনও হিন্দু মনীষীদের সম্পর্কে অনীহা রয়েছে। এটি এক ধরনের মানসিক সংকীর্ণতাই।

মাদানির কথার নিহিতার্থটি বোধহয় এই যে, মুসলিম সমাজের এই অংশটিকে সংকীর্ণতা এবং বিদ্বেষের ঘেরাটোপ থেকে বের করে আনাটাই প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া উচিত। মাদানির প্রাথমিক আক্রমণের লক্ষ্য কংগ্রেস হলেও, আঞ্চলিক দলগুলির

প্রতিও তিনি কটাক্ষ হেনেছেন। মাদানি বলেছেন, 'আঞ্চলিক দলগুলি যেন কারও ভয় দেখিয়ে ভোট না চায়। তারা নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে ভোট চাক।' সমস্যাটি এখানেই। মুসলিম সমাজকে সংকীর্ণতা এবং বিদ্বেষের ঘেরাটোপ থেকে বের করে আনতে যে কৃতিত্ব প্রার্থিত ছিল কংগ্রেস সহ বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী এবং আঞ্চলিক দলগুলির প্রতি—তা তারা দেখাতে.পারেনি। মুসলিম সমাজকে আলোকপ্রাপ্ত করে তোলার বদলে, এই রাজনৈতিক শক্তিগুলি অহেতুক তোষণে মন দিয়েছে। সাদা কথায় বললে, ঘুষ দিয়ে মুসলিম ভোট কিনতে চেয়েছে। ফলে, মুসলিম মৌলবাদীরাই কার্যত প্রশ্রয় পেয়েছে। কংগ্রেস, সমাজবাদী, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, তৃণমূল কংগ্রেস বা বামপন্থী—কেউই এই বার্তাটি মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে পরিষ্কারভাবে দেয়নি যে, অন্যান্য আর পাঁচটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারত রাষ্ট্রের কাছে যে সুযোগ-সুবিধা এবং গুরুত্ব পেয়ে থাকে—মুসলিম সম্প্রদায়ও তাই পাবে। তার অধিক বা তার কম পাবে না। এই বার্তাও কখনও কোনও সরকার পরিষ্কারভাবে দেয়নি যে, ভারত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা রক্ষার দায়িত্ব একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু নাগরিকের নয়; সংখ্যালগিষ্ঠ মুসলিম নাগরিকেরও দায়িত্ব একই। দুঃখের, তবু এটিও ঠিক যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভিতর সুযোগ-সুবিধা বণ্টন করতে গিয়েও, যখন যে ক্ষমতায় এসেছে সে-ই নানাধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ বা পারসিক সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হিসাবে সরকারের কাছ থেকে যে গুরুত্ব বা সুবিধা পেয়ে থাকে, তার শতগুণ বেশি গুরুত্ব এবং সুবিধা যে ভোগ করে মুসলিম সমাজ—একথা অস্বীকার করার নয়। এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই গুরুত্ব এবং সুবিধা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ওঠে। যেটা অন্য সম্প্রদায়ের পক্ষে মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কীরকম মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব—একটি সাম্প্রতিকতম উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যাক। সকলেই অবহিত আছেন, এবছর ইদ এবং দুর্গোৎসব পাশাপাশি পড়ে যাওয়ার ফলে রাজ্য সরকার এই রাজ্যে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন দু'দিন বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এভাবে সরকারের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় কি না। এক্ষেত্রে এটুকু বলা যেতেই পারে—দুর্গোৎসব এবং ইদকে কেন্দ্র করে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তা দেখা অবশ্যই সরকারের কর্তব্য ছিল। সেক্ষেত্রে কড়া নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়ে সরকার প্রতিমা নিরঞ্জনের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করতেই পারত। তা না করে সরকার যেটা করল—তাতে একটি সম্প্রদায় যেমন অহেতুক গুরুত্ব পেল, আর একটি সম্প্রদায় ততোধিক মনঃক্ষুণ্ণ হল। এতে আর যাই হোক সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রইল না। এটাই অহেতুক তোষণ।

সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলার সৎ সাহসের এই অভাব থেকেই ঘুষ দিয়ে, বা জুজু দেখিয়ে মুসলিম ভোট কেনার ছল করতে হয় কংগ্রেস, সমাজবাদী, রাষ্ট্রীয় জনতা, তৃণমূল কংগ্রেস ও বামপন্থীদের। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র

মোদিকে বি জে পি প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে ঘোষণার পর, স্বাভাবিকভাবেই 'জুজু' খুঁজতে আর বেশি বেগ পেতে হচ্ছে না এই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষদের। গুজরাত দাঙ্গার কলঙ্কটিকা নরেন্দ্র মোদির কপালে একবার যখন লেগেছে—তখন এই মুহূর্তে মুসলিম সমাজের কাছে 'জুজু' হিসাবে তাঁকে তুলে ধরাই সহজ কাজ। যেমন একসময় লালকৃষ্ণ আদবানিকে তুলে ধরা হয়েছিল। মোদিকে জুজু হিসাবে তুলে ধরার সময় অনেকে এ সত্যটা ভুলে যাচ্ছেন যে, গুজরাত দাঙ্গার পরও কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি মুলায়ম সিং যাদবের উত্তরপ্রদেশেও হয়েছে। সেইসব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা অদ্যাবধি 'জুজু' হিসাবে কোনও সম্প্রদায়ের কাছে চিত্রিত হননি। তদুপরি, এটিও মনে রাখা জরুরি, গুজরাত দাঙ্গার পর থেকে আজ পর্যন্ত মোদির সাম্রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার একটি সংবাদও পাওয়া যায়নি। গুজরাতে বসবাসকারী মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে এই মুহূর্তে মোদির বিরুদ্ধে বড় কোনও অভিযোগও ওঠেনি। বরং এটাই সত্য যে, আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর গুজরাতে মুসলিম ব্যবসায়ীরাও নিরাপদেই ব্যাবসা-বাণিজ্য করছেন। আসলে, মোদির বিরুদ্ধে এই 'সাম্প্রদায়িকতার' প্রচারের পিছনে অন্য একটি কারণও আছে। প্রথমত, ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে মোদির রাজনৈতিক ক্যারিশমার মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাহুল গান্ধীর মতো অপরিণতবুদ্ধি রাজনীতিকের নেই। দ্বিতীয়ত, প্রশাসক হিসাবে মোদি দেশে-বিদেশে যে গুরুত্ব আদায় করে নিতে পেরেছেন—তা কংগ্রেস বা মোদি-বিরোধী অন্যদের ভাগ্যে জোটেনি। এবং তৃতীয়ত, মুসলমানদের ভিতর হিন্দু বিরোধিতার উসকানি দিয়ে এবং তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সাজার ভড়ংসর্বস্ব এতদিনের চলে-আসা সহজ রাজনীতিটি থেকে অনেকেই বেরিয়ে আসতে পারছে না।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে মুসলমান সম্প্রদায় কী করবে, সংকীর্ণতা এবং বিদ্বেষের ঘেরাটোপ ছেড়ে তারা বেরিয়ে আসবে কি না, নাকি শেষপর্যন্ত মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার ছলনাতেই তারা ভুলে থাকবে—তা ভবিষ্যৎই বিচার করবে। কিন্তু মূল সমস্যাটি এর থেকেও আরও অনেক গভীর। মনে রাখতে হবে—একটি দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তখনই নিরাপদ বোধ করবে, যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের সহানুভূতি এবং ভালোবাসা তার প্রতি থাকবে। বলতে দ্বিধা নেই, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের সহানুভূতি এবং ভালোবাসা কিন্তু অনেকাংশেই সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজের প্রতি আর থাকছে না। আর এই না-থাকার জন্য দায়ী মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা প্রদর্শনকারী রাজনৈতিক শক্তি এবং তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এদের অহেতুক এবং অযৌক্তিক মুসলিম তোষণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বিরূপ করে তুলছে। হিন্দুসমাজের একটি বড় অংশই বৈষম্যের শিকার মনে করছে নিজেদের। অন্যদিকে, মৌলবাদীদের উসকানিতে মুসলিম সমাজের একটি অংশ যথেচ্ছাচারের

মানসিকতা প্রদর্শন করছে। এতে দুই সম্প্রদায়ের ভিতর নৈকট্যের বদলে দূরত্ব এবং বিরোধ আরও বাড়ছে। এই দূরত্ব কমার আপাতত কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ভারত রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অন্তত এই অহেতুক তোষণ বন্ধ রাখাটাই মঙ্গল। নয়তো, কে বলতে পারে হিন্দুরাষ্ট্রের দাবিতে ভারত কোনও দিন উত্তাল হয়ে উঠবে না।

রন্তিদেব সেনগুপ্ত
বর্তমান পত্রিকা, ২২শে অক্টোবর ২০১৩

বাংলাদেশের অত্যাচারিত সংখ্যালঘু হিন্দুরা কেন অচ্ছ্যুৎ হবেন?

সম্প্রতি একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়েছে যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা চালিয়েছে বি এন পি সমর্থকরা। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন এই বি এন পি দলটি যে উগ্র মৌলবাদের দ্বারা প্রভাবিত—সে কথা সকলেই জানেন। বাংলাদেশের প্রধান মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন জামাত-ই-ইসলামির সঙ্গে বি এন পি'র সম্পর্কটা মধুর। খালেদার সরকারকে সমর্থনও জুগিয়েছিল জামাত-ই-ইসলামি। সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশের পাবনায় এবং লালমণিরহাটে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হামলা চালিয়েছে বি এন পি সমর্থকরা। পাবনায় ৬০-৭০টি হিন্দু বাড়িতে ঢুকে ব্যাপক সন্ত্রাস করেছে বি এন পি কর্মীরা। বাড়ি-ঘর ভাঙচুর, লুটতরাজ, বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মারধর কোনও কিছুই বাদ যায়নি। এই মৌলবাদী তাণ্ডবের পর ওই হিন্দু পরিবারগুলি প্রাণভয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। লালমণিরহাটে সাতপাটকি মাঝিপাড়া গ্রামে ১২৫টি হিন্দু পরিবারের উপর হামলা চালিয়েছে বি এন পি সমর্থকরা। সেখানে তাদের বাড়িতে ঢুকে টাকা-পয়সা গয়না-গাঁটি লুট করা হয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মারধর করা হয়েছে। বি এন পি কর্মীদের হাতে প্রহৃত হয়ে ন'জন হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন। আক্রান্ত ১২৫টি পরিবারের মহিলা এবং শিশুরা পালিয়ে গিয়ে পাশের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন। আক্রান্ত হিন্দু পরিবারগুলির অভিযোগ, মৌলবাদী গুণ্ডারা নির্বিঘ্নে হামলা চালিয়ে চলে যাওয়ার তিন ঘণ্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র জন্ম নেওয়ার পিছনে ভারত রাষ্ট্রের অবদান প্রভূত। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ভারত সর্বশক্তি নিয়ে বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে না দাঁড়ালে ওই নতুন রাষ্ট্রটি সেদিন আত্মপ্রকাশ করত কি না—সেটি সত্যই সংশয়ের বিষয়। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সময়কালে মৌলবাদী শক্তি মাথা তুলতে পারেনি। বরং, তখন সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় সে দেশে মোটামুটি শান্তিতেই ছিল। পাক মদতপুষ্ট স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে মুজিব নিহত হওয়ার পর দ্রুত বাংলাদেশের রাজনীতিতে মৌলবাদীদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ক্রমশ বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিও তারা দখল করেছে। বিশেষ করে প্রয়াত জিয়াউর রহমান এবং তদীয় পত্নী খালেদা জিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় জামাত-ই-ইসলামির মতো

মৌলবাদী শক্তির আরও রমরমা বেড়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনা যদিও এই মৌলবাদী শক্তির মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন—বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে যারা পাকশক্তির পক্ষ নিয়ে জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল—তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করছেন—কিন্তু জামাতের মতো মৌলবাদীরা যেভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে—তাতে বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনের পরে হাসিনা ক্ষমতাসীন থাকতে পারবেন কি না—সে সংশয়ও দেখা দিয়েছে। কয়েক মাস আগে এই মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ছাত্রযুবসমাজও আন্দোলনের পথে নেমেছিল। তাতেও এই মৌলবাদী শক্তিকে খুব যে প্রতিহত করা গিয়েছে—তা বোধহয় নয়। কেননা, এরপর মৌলবাদীদের প্রত্যাঘাত আরও কয়েক গুণ বেড়েছে। এতে এটুকু অন্তত বোঝা যায়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মৌলবাদীরা নিজেদের শক্তিশালীই করেছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর এই আক্রমণের ফল কী হতে পারে? তার কী প্রভাব পড়তে পারে এপারে, ভারতে? ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশ জন্মের আগে ওপারে, পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুরা অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় খানসেনারা ঢাকার ঐতিহাসিক ঢাকেশ্বরী মন্দির ধ্বংস করেছিল। সে অত্যাচার স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম নেওয়ার পরও কমেনি। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণনা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ। সাম্প্রতিক জনগণনাতে দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশে বর্তমান হিন্দু জনসংখ্যা ৯ শতাংশেরও কম। অর্থাৎ, ওদেশ থেকে হিন্দু নাগরিকদের এদেশে আসার বা অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধিই পেয়েছে। এর মধ্যে অবশ্য সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে, মূলত পশ্চিমবঙ্গে আসার প্রবণতাই বেশি। এই প্রবণতার কারণ, সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ওদেশে আর নিজেদের নিরাপদ মনে করছে না। ওদেশে তাদের জীবন, জীবিকা, সম্পত্তি বিপন্ন বলেই মনে করছে। সংখ্যালঘু হিন্দুরা যে ওদেশে মুসলিম মৌলবাদীদের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু, তা আর একটি ঘটনাতেও বোঝা যায়। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র জন্ম হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, হিন্দু জনসংখ্যা যে হারে কমেছে, সে হারে কিন্তু বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান সংখ্যালঘু জনসংখ্যা হ্রাস পায়নি। বোঝাই যায়, অন্য সংখ্যালঘুরা হিন্দুদের মতো এতটা বিপন্ন নয়। এই শরণার্থী হিন্দু পরিবারগুলির একটি নিয়মিত অনুপ্রবেশ এদেশে রয়েছেই। এদেশের অর্থনীতিতে এটি চাপও বাড়াচ্ছে—তাও অস্বীকার করা যাবে না। কাজেই, মুসলিম মৌলবাদীদের অত্যাচারে ওপার থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা হিন্দু শরণার্থীদের সম্পর্কে ভারতের, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের উদাসীন হয়ে থাকা বোধকরি উচিত কাজ হবে না।

প্রশ্নটা হচ্ছে—ওপার থেকে শরণার্থী হিসাবে চলে আসা এই হিন্দু পরিবারগুলি বা ওপারে মৌলবাদীদের দ্বারা ক্রমাগত অত্যাচারিত হতে থাকা সংখ্যালঘু হিন্দুদের

সম্পর্কে কী দৃষ্টিভঙ্গি এপারের সুধীজনদের? বিশেষ করে প্রশাসনের শীর্ষ স্থানাধিকারী, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, সমাজকর্মী—প্রমুখের? বামপন্থী, আধা বামপন্থী, চরম বামপন্থী, গান্ধীবাদী, মানবতাবাদী, দুঃখের হলেও বলতে হচ্ছে, এঁদের কোনও একজনকেও এখনও পর্যন্ত ওপারে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর মুসলিম মৌলবাদীদের এই অত্যাচারের প্রতিবাদে টুঁ শব্দটিও করতে দেখা যায়নি। কংগ্রেস, বাম, তৃণমূল কংগ্রেস — প্রশাসনের শীর্ষে যখনই যে কর্তারা আসুন না কেন, তাঁরাও প্রতিবেশী রাজ্যে সংখ্যালঘুদের নিপীড়নের ঘটনায় বিন্দুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলেও জানা যায় নি। কোনও এক অদ্ভুত কারণে এঁরা প্রত্যেকেই অত্যাচারিত হিন্দুদের সম্পর্কে নীরব থাকার ব্রত নিয়ে ফেলেছেন। এরই পাশাপাশি আছেন এই দেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মুসলিম সমাজ। এই মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা আরও রহস্যজনক। এই মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা যতটা সোৎসাহে হিন্দু মৌলবাদের বিরোধিতা করেন, সভা-সমিতি-মিটিং-মিছিল করেন; এদেশে সংখ্যালঘু মুসলিমরা কতটা অবহেলিত তার বিস্তারিত ফিরিস্তি পেশ করেন—তার এক শতাংশ সময়ও এঁরা ব্যয় করেন না ওপারে মুসলিম মৌলবাদীদের হাতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিগৃহীত হওয়ার প্রতিবাদে। এমনকী, বাংলাদেশের শাহবাগ আন্দোলনের বিরোধিতা করে খোদ কলকাতায় যখন জামাত-ই-ইসলামির মতো মৌলবাদী সংগঠন সমাবেশ করে—তার প্রতিবাদ করতেও এই বিশিষ্ট মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের খুব বেশি আগ্রহ দেখা যায় না। সম্প্রতি এ-ও লক্ষ করলাম, পাটনার বিস্ফোরণের পর যখন সন্দেহভাজন মুসলিম জঙ্গিরা ধরা পড়ছে, তখন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে কোনও কোনও মুসলিম বুদ্ধিজীবী মন্তব্য করছেন—দৃষ্টি ঘোরাতে 'নিরাপরাধ মুসলমানদের' নাকি হেনস্তা করা হচ্ছে। ভাবুন, তা হলে!

স্বাভাবিকভাবেই তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবী এবং প্রশাসকগণের এই আচরণ—এঁদের সম্পর্কেই সন্দেহের সৃষ্টি করে। প্যালেস্তাইন, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান—সর্বত্রই সর্বস্ব হারানো গৃহহীনদের জন্য যদি মন কেঁদে ওঠে এই বামপন্থী, আধা-বামপন্থী, চরম বামপন্থী, গান্ধীবাদী এবং মানবতাবাদীদের—তা হলে বাংলাদেশে যে হিন্দুরা প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হচ্ছেন, নিজেদের জন্মভিটে থেকে উচ্ছেদ হয়ে উদ্বাস্তুর মতো চলে আসতে বাধ্য হচ্ছেন এদেশে—তাঁদের সম্পর্কে এত অনীহা কেন? কেন তাঁদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে একটি শব্দও ব্যয় করবেন না এঁরা? বাংলাদেশের এই সংখ্যালঘু হিন্দুরাও তো সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন। কেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘু অত্যাচারিত হিন্দুরা অচ্ছুৎ হয়ে থাকবেন এঁদের কাছে? সে কি শুধুমাত্র তাঁরা হিন্দু বলেই? এক্ষেত্রে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রয়াত চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন নগ্ন সরস্বতী অঙ্কন করে একদা হিন্দু মৌলবাদীদের রোষের মুখে পড়েছিলেন। সেই সময় হিন্দু মৌলবাদীদের তাণ্ডবের

প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন নানা রঙের, নানা মতের এই বিশিষ্টজনেরা। সরব হয়েছিলেন এদেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও। এতে অবশ্য কোনও অন্যায় তাঁরা করেননি। হিন্দু মৌলবাদীদের ওই আচরণ নিন্দারই যোগ্য ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার—এরপর যখন তসলিমা নাসরিনকে মুসলিম মৌলবাদীদের আক্রমণের মুখে পড়ে এদেশ থেকে বিতাড়িত হতে হল—তখন এই বিশিষ্টজনদের কাউকেই তসলিমার পাশে দাঁড়াতে দেখা গেল না। অবশ্য, তসলিমা হিন্দু মৌলবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে এঁরা নীরব থাকতেন না নিশ্চয়ই। এক্ষেত্রে এটাই প্রমাণ হয় যে, এঁদের কারও কারও মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার তাকত নেই; আর কারও কারও মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছা নেই। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কাহিনি শুনেও এঁরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন এই কারণেই।

মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের এই নীরবতার একটি কারণ অবশ্য সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁরা যতই প্রগতিশীল বলে জাহির করুন না কেন নিজেদের প্রকৃত অর্থে মুসলিম মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তাঁরা ইচ্ছুক নন। কিন্তু এঁদের বাদ দিলে যে বামপন্থী, আধা-বামপন্থী, মানবতাবাদী, গান্ধীবাদীরা পড়ে রইলেন? এই অংশটি মনে হয়, এক ধরনের বিভ্রান্তিতে ভোগেন। এঁরা হয়তো মনে করেন, মুসলিম মৌলবাদের বিরোধিতা করলে, তা ইসলামেরই বিরোধিতা করা হয়ে গেল। এর ফলে বোধকরি আর সেকুলার ভাবমূর্তি রক্ষা করা গেল না। এঁরা বোঝেন না যে, ধর্ম আর মৌলবাদ—দুটি সম্পূর্ণ পৃথক। হিন্দু মৌলবাদ যেমন হিন্দু ধর্ম নয়, তেমনই মুসলিম মৌলবাদও ইসলাম ধর্ম নয়। প্রকৃত ধার্মিক কখনও মৌলবাদী হন না। আবার প্রকৃত ধার্মিক না হলে সেকুলার হওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলার। ভারতের প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে যখন সংখ্যালঘু হিন্দু জনসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে—তখন ভারতে কিন্তু চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে এখনও পর্যন্ত সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধিই ঘটেছে। সেই বৃদ্ধি এতটাই যে, মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলী এখন ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এখন আর নিছক হীনবল সংখ্যালঘু বলা যায় না। এতে আর কিছু নয়, এটিই প্রমাণ হয় যে, সংখ্যাগুরু হিন্দুর দেশ ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী বিপন্ন নয়। দু-একটি হিংসার ঘটনা দিয়ে সামগ্রিকভাবে এদেশে মুসলিম সমাজ বিপন্ন—এমন চিত্র অঙ্কন করাটা বা এমন প্রচার (যা কেউ কেউ করেন) করা বোধকরি উচিত কাজ হবে না।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিকের উপর মুসলিম মৌলবাদীদের এই অত্যাচারের ঘটনায় এঁরা যে আশ্চর্যরকম নীরবতা পালন করেন—এতে আর কিছু নয়, পরোক্ষে মৌলবাদকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এঁরা বোঝেন না, মুসলিম মৌলবাদের এই

সমস্যাটি শুধু ভারত, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের নয়। মুসলিম মৌলবাদের এই সমস্যাটি এখন বিশ্বব্যাপী। মুসলিম মৌলবাদই এই মুহূর্তে বিশ্বের সামনে সবথেকে বড় বিপদ। বড় বিপদ এই কারণেই যে, এই মুসলিম মৌলবাদ অত্যন্ত সুসংহত এবং আগ্রাসী। সমগ্র বিশ্বে সে তার আগ্রাসন চালাতে চায়। আর এই আগ্রাসনে তার একমাত্র অস্ত্র হিংসা। হিংসা, হিংসা আর নিরন্তর হিংসা। মুসলিম মৌলবাদের এই বিপদের সামনে বালিতে মুখ গুঁজে থাকা মূর্খামিই হবে। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে, যেখানেই মুসলিম মৌলবাদ তার আঘাত হানতে চাইবে—সেখানেই পালটা প্রতিরোধ গড়ে তোলাই এই মুহূর্তের অবশ্য করণীয় কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। বিশ্ব শান্তির স্বার্থে, মানবতার স্বার্থে মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াইটা অবিলম্বে শুরু হওয়াই দরকার। এই সত্যটিকে যাঁরা অনুধাবন করতে পারবেন না—তাঁরা ধর্মকেই বিনষ্ট করবেন, বিপন্ন করবেন দেশ ও জাতিকে।

—রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বর্তমান পত্রিকা, ১২ই নভেম্বর ২০১৩

কে অনুপ্রবেশকারী, আর কে শরণার্থী, সেটিই বোঝেন না তথাকথিত সেকুলারপন্থীরা

এবার নির্বাচনের আগে, প্রচারপর্বে, বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের তিনি বিতাড়ন করবেন। মোদির এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে নির্বাচনের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্তও হয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস এবং বামপন্থীরা এই ইস্যুতে মোদিকে 'সাম্প্রদায়িক' তকমা মেরে দিয়েছেন। এর ভিতর আবার তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদির প্রতি সবথেকে আক্রমণাত্মক হয়েছেন। মোদির প্রতি আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে শালীনতার সীমাও লঙ্ঘন করেছেন তিনি। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, ক্ষমতা থাকলে বাংলাদেশিদের এরাজ্য থেকে বিতাড়ন করার চেষ্টা করুন মোদি। এই পর্যায়ে মোদিকে 'মূর্খ' বলতেও দ্বিধা করেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের পাশাপাশিই রয়েছেন এই রাজ্যের তথাকথিত 'সেকুলার' বুদ্ধিজীবী মহল এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাজনদার সুশীলজনেরা। এঁরাও বলতে শুরু করেছেন—বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করার হুমকি দিয়ে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি বাংলায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াচ্ছেন। এঁদের ভিতর কেউ কেউ আবার এমন প্রচারও শুরু করেছেন যে, ১৯৪৭ সালের পর যাঁরা বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছিলেন তাঁদেরও মোদির হুমকির পর বাক্স-প্যাঁটরা গোছাতে হবে। এ-হেন রং-চড়ানো আক্রমণে অবশ্য মোদিকে দমানো যায়নি। মোদি এরপরও বলেছেন, ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের তিনি বিতাড়ন করবেন। 'অনুপ্রবেশকারী' বলতে তিনি কাদের বোঝাচ্ছেন—সে ব্যাখ্যাও মোদি দিয়েছেন।

প্রশ্নটা এখানেই। সত্যিই কি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের কথা বলে মোদি অন্যায় করেছেন? এই কথার ভিতরে কি প্রমাণিত হয়েছে, তিনি সাম্প্রদায়িক? অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর কথা বলায়, মনে কি হচ্ছে মোদি মূর্খ? এ আলোচনার শুরুতেই একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, মোদি একবারের জন্যও উদ্বাস্তু বা শরণার্থীদের তাড়ানোর কথা বলেননি। মোদি প্রথমাবধি বলে আসছেন, ক্ষমতায় এলে তিনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করবেন। তদুপরি, এটিকে শুধু মোদির কথা বললে ভুল বলা হবে। মোদি একথা বলার অনেক আগে থেকেই এটি ভারতীয় জনতা

পার্টির ঘোষিত রাজনৈতিক লাইন। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের প্রতিবাদে আজ যাঁরা সরব হয়েছেন, মোদিকে 'মূর্খ' এবং 'দাঙ্গাবাজ' আখ্যা দিচ্ছেন, সমস্যাটি হল, তাঁরা শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারীর তফাতটিই বোঝেন না। বা, বুঝলেও মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য উলটো কথাটি বলে থাকেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন বলেই এঁরা বলতে থাকেন—মোদি ক্ষমতায় এলে ১৯৪৭ সালে উদ্বাস্তু হয়ে আসা হিন্দু পরিবারগুলিকে এদেশ থেকে বিতাড়ন করা হবে। তাহলে সত্যটি কী? এক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘ যে উদ্বাস্তু বা শরণার্থীর সংজ্ঞা দিয়েছে সেটি একবার স্মরণ করা দরকার। ১৯৫১-র রাষ্ট্রসংঘের কনভেনশনে, যা ১৯৬৭ সালে প্রোটোকলে সংশোধিত হয়, তাতে উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে— "যে ব্যক্তির জাতি, ধর্ম, নাগরিকত্ব বা কোনও সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্থার সভ্য হওয়ার কারণে নিপীড়িত হওয়ার যথেষ্ট উপযুক্ত আশঙ্কা রয়েছে বলে তাঁর নাগরিকত্ব যে দেশের, তার বাইরে রয়েছেন, অথবা এই ভীতির জন্য তাঁর দেশের নিরাপত্তা নিতে আগ্রহী নন; অথবা এইসব কারণে নিজের দেশের বাইরে রয়েছেন এবং ফিরতে পারছেন না বা এই ভীতির জন্য ফিরতে ইচ্ছুক নন।" রাষ্ট্রসংঘের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময় থেকে এই পর্যন্ত বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের যে মানুষরা নানাভাবে অত্যাচারিত হয়ে এবং নিরাপত্তার অভাবে এ দেশে চলে এসেছেন— তাঁরা শরণার্থী বা উদ্বাস্তু। একবারের জন্যও মোদি বা ভারতীয় জনতা পার্টি এঁদের অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দিচ্ছেন না। বরং ১৯৪৭-এর দেশভাগ পরবর্তী সময়ে যে হিন্দু পরিবারগুলি অত্যাচারিত হয়ে এদেশে চলে এসেছিল, তাদের এদেশে প্রবেশ করার সময় একটি রিসিট (Receipt) দেওয়া হয়েছিল। এরই ভিত্তিতে পরবর্তীকালে তাঁদের ভারতীয় নাগরকিত্বও দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭১-এর ২৬ মার্চের পর যে হিন্দু পরিবারগুলি এদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, তাদের বলা হচ্ছে 'অস্বীকৃত শরণার্থী'। এদের বিতাড়নের কথা একটি বারের জন্যও মোদি বলেননি। বরং এদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথাই বিজেপি এবারও তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে বলেছে। তাহলে মোদি কাদের কথা বলেছেন? মোদি বলেছেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের'র কথা। এই অনুপ্রবেশকারী কারা? অনুপ্রবেশকারী তারাই, যারা অত্যাচারিত বা নিপীড়িত হয়ে নয়, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে এদেশে প্রবেশ করছে এবং পাকাপাকিভাবে এদেশে বসবাস করার চেষ্টা করছে। এই অনুপ্রবেশকারীর সংজ্ঞায় পড়ছেন বাংলাদেশি মুসলমানরা। যাঁরা নিজেদের দেশে মোটেই অত্যাচারিত নন। এক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে, মোদি কিন্তু এই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের কথাই বলছেন; ভারতীয় মুসলিমদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—এমন বিদ্বেষমূলক কথা মোদি একবারও বলেননি।

যে তথাকথিত সেকুলাররা আজ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন, তাঁরা অনুপ্রবেশজনিত সমস্যাগুলিকে হয় ভুলে গিয়েছেন, বা, ইচ্ছাকৃতভাবে

ভুলে থাকতে চেয়েছেন। ২০০৪ সালের ১৪ জুলাই লোকসভায় কংগ্রেস সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল জানিয়েছিলেন, ভারতে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫০ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আছেন। তার আগে ১৯৯০-তে কমিউনিস্ট নেতা, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত লোকসভায় বলেছিলেন, ভারতে প্রায় এক কোটি বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। আর রাজ্যের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর দলীয় মুখপত্র গণশক্তিতে ১১ অক্টোবর, ১৯৯২ তারিখে লিখেছিলেন, "১৯৭১ থেকে মুসলমানরা ভারতে আসতে শুরু করল। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বিএসএফ ২,৩৫,৫২৯ জন বাংলাদেশিকে সনাক্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৬৮, ৪৭২ জন হিন্দু আর ১,৬৪,১৩২ জন মুসলমান। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত মোবাইল টাস্ক ফোর্স ২,১৬,৯৮৫ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৫৬,৩৪২ জন হিন্দু ও ১,৬৯,৭৯৫ জন মুসলমান।" তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর লেখাতেই প্রমাণ, ওই সময়কালের ভিতর যে বাংলাদেশিদের বিতাড়ন করা হয়েছিল, তার ৭৫ শতাংশই মুসলমান। মনে রাখা দরকার, শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বা জ্যোতি বসু—কেউই ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা ছিলেন না। বরং, রাজনৈতিকভাবে এই তিনজনকেই ভারতীয় জনতা পার্টির ঘোরতর বিরোধী হিসেবেই চিহ্নিত করতে হবে কিন্তু তাঁদের পেশ করা এই হিসাবের ভিতরই অনুপ্রবেশের ভয়াবহতাটি বোঝা যাচ্ছে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ যে ভয়াবহ আকার ধারণ করছে এবং এর ফলে দেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, বদলে যাচ্ছে জনবিন্যাস—এটি উপলব্ধি করেই কিন্তু উপরোক্ত তিনজন এই হিসাব দাখিল করেছিলেন। এরই পাশাপাশি, অনুপ্রবেশজনিত আর একটি মারাত্মক আশঙ্কার কথাও উড়িয়ে দিলে চলবে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বারেবারেই এই রাজ্যকে সতর্ক করেছে—এই অনুপ্রবেশকারীদের ভিড়ে রয়েছে জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনগুলি এবং পাক গুপ্তচর বাহিনীর সদস্যরা। ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যেই বেআইনিভাবে তারা অনুপ্রবেশ করছে এই দেশে। আজ যে সেকুলার পন্থীরা রাতারাতি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য চোখের জল ফেলতে শুরু করেছেন, তাঁরা দেশের প্রকৃত মঙ্গল চাইলে অন্তত এই সমস্যাগুলির কথা স্মরণে রাখতেন। তা না রেখে তাঁরা যখন সেকুলার সাজার লোভে মায়াকান্না কাঁদতে বসেন—তখন তাঁদের দেশপ্রেম নিয়েই সন্দেহ তৈরি হয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করুন বা না করুন, অতীত বলছে এই বেআইনি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তিনি এক সময় সরব হয়েছিলেন। ২০০৫ সালে সংসদ-কক্ষে হাতের ফাইল এবং কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এ ঘটনা অস্বীকার করে বলেছেন, তাঁর প্রতিবাদটা ছিল ভোটার তালিকায় কারচুপির বিরুদ্ধে। অবশ্যই ভোটার তালিকায় কারচুপির বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ

ছিল। কিন্তু তিনি একটু লোকসভা বিবরণীর পাতা ওলটান, তাহলেই দেখতে পাবেন— তাঁর অভিযোগের একটি অংশ ছিল যে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম তৎকালীন শাসক দল সিপিএম ভোটার তালিকায় তুলে দিচ্ছে। একথা একবারও বলা যাবে না যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন কোনও অসত্য অভিযোগ তুলেছিলেন। বরং, তাঁর সেদিনের তোলা সেই অভিযোগ কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও সরকারের কাছেই আমল পায়নি। মোদি যদি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করেন, তাহলে মমতার সেই অভিযোগই কিন্তু আজ মান্যতা পাবে। অবশ্য, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর অতি দ্রুত অতীত বিস্মৃত হওয়ার একটি অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে।

যে তথাকথিত সেকুলারপন্থীরা আজ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য শোকে আকুল হচ্ছেন— দেশবিভাগের সময়কালের ইতিহাসটিও তাঁদের একটু অনুশীলন করা দরকার। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে আনতে এবং মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-শহিদ সোহরাবর্দিদের যুক্তবঙ্গের প্রস্তাব খারিজ করতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো জাতীয় নেতার কী অসীম দূরদৃষ্টি সেদিন কাজ করেছিল—তা যদি এই সেকুলারপন্থীরা একটু অনুশীলন করতেন, তাহলে, আশা করি, আজ তাঁরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হয়ে সওয়াল করতে ময়দানে নামতেন না। জিন্নাহ্র পাকিস্তানে যে হিন্দু জনগোষ্ঠী কখনও মানুষের সম্মান পাবে না—এ সত্যটি শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন। হিন্দুদের প্রতি জিন্নাহ্র কী হীনদৃষ্টি এবং ঘৃণা ছিল, তা লিখে গিয়েছেন লর্ড ইজমে। ইজমে লিখেছিলেন, 'The dominating feature in Mr. Jinnah's mental structure was his loathing and contempt of Hindus. He apparently thought that all Hindus were sub-human creatures with whom it was impossible for the Muslim to live.' জিন্নাহ্র এই চরিত্রের আঁচ পেয়েই শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন বাংলাদেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্য স্বতন্ত্র ভূমি প্রয়োজন। পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনাগুলি বিচার করলেই বোঝা যাবে কতটা দূরদর্শিতার প্রমাণ সেদিন শ্যামাপ্রসাদ দিয়েছিলেন। জিন্না এবং সোহরাবর্দি সে সময় যে স্বাধীন যুক্তবঙ্গের প্রস্তাব এনেছিলেন, তাও যে কার্যত ভবিষ্যতে সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানে ঢোকানোর অপচেষ্টা মাত্র— সেটিও সেদিন দূরদর্শী শ্যামাপ্রসাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর কংগ্রেস সেদিন পাঞ্জাবের সংখ্যালঘু বিনিময় নিয়ে আগ্রহী হলেও, বাংলা নিয়ে আগ্রহী ছিলেন না। কার্যত, শ্যামাপ্রসাদ জিন্নাহ্-সোহরাবর্দিদের কবল থেকে ছিনিয়েই এনেছিলেন পশ্চিমবঙ্গকে। আজ যাঁরা সেকুলারিজমের ফানুস ওড়াচ্ছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত, 'অসাম্প্রদায়িক পশ্চিমবঙ্গে' যে তাঁরা বাস করতে পারছেন, তা সম্ভব হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপায়্ধায়ের জন্যই। আরও তাঁদের মনে রাখা উচিত, পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টিই হয়েছিল বাংলা ভাগ হওয়ার পর হিন্দু বাঙালি জনগোষ্ঠীর নিজভূমি হিসেবে। মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর অবাধ বিচরণক্ষেত্র হিসাবে নয়।

লেখাটি শেষ করব, তথাকথিত সেকুলারপন্থী, কংগ্রেস, বামপন্থী এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি কয়েকটি প্রশ্ন রেখে। (ক) পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে কখনওই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে সে দেশে থাকতে দেওয়া হয় না। বরং, ধরা পড়লে তাদের 'পুশ-ব্যাক' করাই রীতি। ওইসব দেশের সরকারগুলিকে কি আমরা সাম্প্রদায়িক বা বিদ্বেষমূলক আখ্যা দেব? (খ) পৃথিবীর কোনও দেশে কি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের জামাই আদরে রাখা হয়, না, তাদের বিতাড়ন করার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদ ওঠে? (গ) ভারতীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিত সম্প্রদায় যখন সেই রাজ্য থেকে মৌলবাদীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়—তখন এই সেকুলারপন্থীরা নীরবতা অবলম্বন করেন কেন? (ঘ) বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত, বিতাড়িত হিন্দু জনগোষ্ঠী সম্পর্কে এই সেকুলারপন্থীরা কেন সহানুভূতি প্রকাশ করেন না? (ঙ) পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ কি তাদের দেশে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয়দের নির্বিঘ্নে থাকতে দেবে? তারাও কি সেই অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করবে না?

আমি জানি, এই প্রশ্নগুলির একটিও সদর্থক উত্তর সেকুলারপন্থীদের কাছে নেই। কারণ, সেকুলারিজমের নামে তাঁরা যে কাজটি করে চলেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে দেশকে আর একবার অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দেওয়া। এ সর্বনাশা পথটি তাঁরা পরিহার করলেই ভালো।

—রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বর্তমান পত্রিকা, ১৩ই মে ২০১৪

অনুপ্রবেশকারী প্রশ্নে এবার কঠোর হোন মোদি

এই রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি বলে গিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে তিনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করবেন। এ-ও বলেছিলেন, অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের প্রশ্নে তিনি কোনওরকম আপস করবেন না। মোদির এই বক্তব্য নিয়ে সে সময় বিস্তর বিতর্ক হয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, বামপন্থী সকলে মিলে মোদির বক্তব্যের বিরোধিতা করে, শরণার্থী এবং অনুপ্রবেশকারীর ভিতর প্রভেদটি গুলিয়ে দিয়ে বেজায় শোরগোল তুলেছিল। মোদিকে কোমরে দড়ি পরিয়ে জেলে ঢোকানোর কথাও বলেছিলেন কেউ কেউ। আপাতত সেসব অবশ্য ইতিহাস। জনগণের রায়ে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দল বিজেপি লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। অটলবিহারী বাজপেয়ির বিজেপি যা পারেনি, নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সেটি পেরেছে। তিন দশক পরে কেন্দ্রে আবার একটি দলের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এইরকম একটি জবরদস্ত সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। মানুষ আশা করে, নির্বাচনী প্রচারে বর্তমান শাসকদলের নেতৃবর্গ, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন— ক্ষমতায় আসার পর সেগুলি পালনে তিনি সচেষ্ট হবেন। নির্বাচনী প্রচারে নরেন্দ্র মোদি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—দেশের পরিচালনভার গ্রহণ করার পরে সেগুলি পালনে তিনি আন্তরিকতা দেখাবেন—এমন যদি এখন মানুষ মনে করে খুব ভুল কিছু হবে না। নরেন্দ্র মোদির দেওয়া অন্যসব প্রতিশ্রুতিগুলির প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করার যে প্রতিশ্রুতি নরেন্দ্র মোদি দিয়ে গিয়েছিলেন—সে প্রসঙ্গেই কিছু কথার অবতারণা করতে চাইছি।

প্রথমত, একটি কথা মনে রাখা ভালো যে, কেন্দ্রে এখন বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। কোনও শরিকের চোখ রাঙানি বা চাপের রাজনীতির পরোয়া তাকে আর না করলেও চলে। ফলে, বাজপেয়ি যা করতে পারেননি, নরেন্দ্র মোদি অনায়াসেই তা করতে পারেন। এইরকম অবস্থানে থেকে মোদির পক্ষে কঠোর, বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক সহজ। দ্বিতীয়ত, এটিও মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশজনিত সমস্যাটি বেশ গুরুতর। এই সমস্যাটিকে অবিলম্বেই সমূলে বিনষ্ট করা দরকার। এই একই সমস্যা অসম এবং ত্রিপুরার মতো উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও মারাত্মক। যদিও এই আলোচনায় ওই রাজ্য দুটির প্রসঙ্গ আনছি না। এর আগে পূর্বতন

কংগ্রেস সরকার বা তারও আগে কেন্দ্রে জনতা দলের সরকার—এইসব সরকারের প্রদত্ত তথ্যেই দেখা গিয়েছে, ভারতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা এক কোটিরও বেশি। এই অনুপ্রবেশকারীদের গরিষ্ঠাংশেরই ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ। এর আগে, দিল্লি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় থাকার সময় তারাও অভিযোগ তুলেছিল, খোদ দিল্লি শহরেই তিন লক্ষেরও বেশি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। দুর্ভাগ্যের যে, এইসব তথ্য দেওয়ার পরও অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ কোনও সরকারের তরফ থেকে দেখা যায়নি। ফলত, অন্যসব রাজ্যের কথা বাদ দিয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই বলছি, অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে এরাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অবৈধ এবং বেআইনি অসামাজিক কাজকর্ম যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনই অর্থনীতির উপর চাপ পড়ছে, বদলে যাচ্ছে সামাজিক এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠীবিন্যাস। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই অবাধ অনুপ্রবেশ রোধে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারই কঠোর পন্থা অবলম্বন করতে চায়নি। বরং, তোষণ এবং ভোটের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশকারীদের হাতের তাসের মতোই ব্যবহার করেছে তারা। আবার এই প্রথম দেশের কোনও প্রধানমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের কথা বলেছেন। ফলে, এরকম আশা করলে অন্যায় হবে না যে, নরেন্দ্র মোদি অনুপ্রবেশ বন্ধে এবং অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের প্রশ্নে কঠোর পন্থাই অবলম্বন করবেন।

পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রবেশজনিত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কিন্তু স্বাভাবিক সমস্যাগুলির বাইরেও আর একটি ভয়াবহ আশঙ্কার কথাও মাথায় রাখতে হবে। অসামাজিক কাজকর্ম বৃদ্ধি, অর্থনীতির উপর চাপ, সামাজিক-রাজনৈতিক গোষ্ঠীবিন্যাস এসব ব্যতীতও এই রাজ্যে অবাধ অনুপ্রবেশের পিছনে একটি রাজনৈতিক দূরভিসন্ধিও রয়েছে। যা ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। এই রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিটি বুঝতে গেলে ইতিহাস অনুশীলন করতে হবে। আর ইতিহাস অনুশীলন করলে দেখা যাবে, দেশভাগের বহু পূর্বেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবিতে মুসলিম লিগ এবং তাদের নেতৃত্ব সরব হয়েছিল। ১৯০৫-০৬-এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সরিয়ে আনার লক্ষ্যে ভাইসরয় লর্ড কার্জন এবং তারপর লর্ড মিন্টোর প্ররোচনায় প্রিন্স আগা খান এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ আসরে নামেন। সলিমুল্লাহকে কার্যত ঘুষ দিয়ে পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বাধিয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। সে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের হিন্দু জনগোষ্ঠী। বাংলায় মুসলিম লিগের আগ্রাসনের সেই শুরু। এরপর ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে মুসলিম লিগের অধিবেশনে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য ভারতের বাইরে অথবা ভারতের ভিতরেই স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবি ওঠে। এদেশের সেকুলারপন্থীরা যাঁকে 'ভারতপ্রেমিক' আখ্যায় ভূষিত করেছেন, সেই উর্দু কবি ইকবাল স্বয়ং এই দাবি তোলেন। ইকবাল বলেছিলেন— 'I would like to see Punjab, North-West Forntier Province,

Sind and Baluchistan amalgamated into a single state. Self government with the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-West Indian Muslim state appears to me be the final destiny of the Muslims at least of North-West India.

এই দাবিই পরবর্তীকালে আরও প্রকট হয়ে ওঠে মহম্মদ আলি জিন্নাহ-র কণ্ঠে। ভারতভাগের দাবিতে তিনি যে কতখানি আগ্রাসী এবং উগ্র হতে পারেন তা জিন্নাহ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ১৯৪৬ সালে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশনে'র ডাক দিয়ে। জিন্নাহ বলেছিলেন, 'Now the time has come for the Muslim Nation to resort to direct action, I am not prepared to discuss ethics. We have a pistol and are in position to use it.'

জিন্নাহ্-র এই বক্তব্যের ফলশ্রুতি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস। যা যে কোনও সভ্য সমাজকেই লজ্জা দেবে। জিন্নাহ্-র এই হুমকির মর্মার্থ সেদিন বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন হিন্দু নেতৃবৃন্দ। তার ফল ভোগ করতে হয়েছিল বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীকে। পাকিস্তানের দাবি জানাতে গিয়ে জিন্নাহ্ কিন্তু সমগ্র বাংলাকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। পোকায় কাটা পাকিস্তান জিন্নাহ্ চাননি। তা তিনি জানিয়েওছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে। কিন্তু, তাঁর দাবি পূরণ হবে না—এটা বুঝতে পেরে জিন্নাহ্ এবং ক্যালকাটা কিলিংসের আর এক নায়ক শাহিদ সোহরাওয়র্দি একটি চাল চেলেছিলেন। সোহরাওয়ার্দিকে দিয়ে স্বাধীন যুক্তবঙ্গের দাবি তুলিয়ে দিয়েছিলেন জিন্নাহ্। বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করে সেই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বসেছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। জিন্নাহ্ ভেবেছিলেন, স্বাধীন যুক্তবঙ্গ কোনওক্রমে গঠন করা গেলে, পরবর্তীকালে তাকে অনায়াসেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যাবে। জিন্নাহ্-র এই চালটি বুঝেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্যামাপ্রসাদ আরও বুঝেছিলেন, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংসের নায়ক জিন্নাহ্-র পাকিস্তানে হিন্দু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। এটা বুঝতে পেরেই শ্যামাপ্রসাদ স্বাধীন যুক্তবঙ্গের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। **বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীর বাসভূমি হিসাবে ছিনিয়ে এনেছিলেন পশ্চিমবঙ্গকে।**

দুর্ভাগ্যের হলেও, এটা সত্য, হিন্দু জনগোষ্ঠীর বিপন্নতাকে শ্যামাপ্রসাদ যেভাবে বুঝেছিলেন, তা বোঝেননি গান্ধী এবং নেহরু। দেশভাগ পর্বে গান্ধী, নেহরু এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পাঞ্জাবের শরণার্থী সমস্যা নিয়ে যতটা মনোযোগী ছিলেন, বাংলার সমস্যা নিয়ে ততটা মনোযোগী তাঁরা ছিলেন না। বরং, দেশভাগের প্রাক্-মুহূর্তে গান্ধী দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালিতে গিয়ে অত্যাচারিত হিন্দু পরিবারগুলিকে ওই দেশেই থেকে যাওয়ার 'উপদেশ' বিতরণ করে এসেছিলেন। জিন্নাহ্-র পাকিস্তানে তারা যে নিরাপত্তাহীন—এটিই গান্ধী বুঝতে চাননি। এমনকী, দেশভাগের পরেও কংগ্রেস সরকার পূর্ববঙ্গের হিন্দু শরণার্থীদের সমস্যা অনুধাবন করতে চায়নি। ১৯৫০ সালে

নেহরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করে সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, দু'দেশের ভিতর সংখ্যালঘু বিনিময় করা হোক। সে প্রস্তাব নেহরু মানেননি। আর, দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আসা অত্যাচারিত হিন্দু পরিবারগুলিকে বলপূর্বক সরকার দণ্ডকারণ্যে অসহ পরিবেশের ভিতর ঠেলে দিয়েছিল।

জিন্নাহ্ যে আগ্রাসনের রাজনীতিটি চালু করে দিয়ে গিয়েছিলেন ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দিয়ে, সেই আগ্রাসনের রাজনীতিটি আজও অবধি অব্যাহতই রয়েছে। ডাইরেক্ট অ্যাকশনের মতো তা হয়তো প্রত্যক্ষ নয়; কিন্তু তা নীরব এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে পরিকল্পিত। কেমন সে নীরব আগ্রাসনের রাজনীতিটি? সেটি বোঝা যাবে, দেশভাগ পরবর্তী সময় থেকে এই পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়ন এবং হিন্দু নিধনের পাশাপাশি এই বাংলায় মুসলিম অনুপ্রবেশকারীর আকাশছোঁয়া বৃদ্ধির ভিতর। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে ১৯৫১ সনের জনগণনা অনুযায়ী হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ। এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৮ শতাংশ। হিন্দু জনসংখ্যার এই ব্যাপক হ্রাসের কারণ, তাদের উপর অত্যাচার এবং সে কারণে তাদের দেশত্যাগ। এই তথ্য অনুযায়ী বলাই যায়, দেশভাগ পরবর্তী সময় থেকেই পূর্ববঙ্গ এবং অধুনা বাংলাদেশে এই এথনিক ক্লিনজিং চলছেই। পাশাপাশি, ১৯৫১-র জনগণনা অনুযায়ী এই রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১৯.৮৫ শতাংশ। বর্তমানে তা ৩১ শতাংশেরও বেশি। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে শুধু মুসলিম ভোটারই বৃদ্ধি করেছে তা নয়, মুসলিম অধ্যুষিত নির্বাচনী এলাকাও বৃদ্ধি পেয়েছে এর ফলে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিধানসভা কেন্দ্রগুলি পুনর্বিন্যাস হওয়ার ফলে কলকাতার বিধানসভা কেন্দ্র ২১ থেকে কমে ১১ হয়েছে। পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে কমেছে দুটি করে কেন্দ্র; বর্ধমান, হুগলি ও বীরভূমে একটি করে। অন্যদিকে, মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদে ৩টি, উত্তর দিনাজপুর ও নদিয়ায় দুটি এবং মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে একটি করে আসন বেড়েছে। এতেই বোঝা যাবে, এই রাজ্যের সামাজিক, রাজনৈতিক বিন্যাস কেমনভাবে বদলে যাচ্ছে। এ বদল যে ভবিষ্যতে এই রাজ্যের রাজনৈতিক-সামাজিক ভারসাম্যে আঘাত হানবে না—এমন কিন্তু বলা যায় না। মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় মুসলিম লিগের রাজনীতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন কেউ কেউ। 'সেকুলার' সাজার আড়ালে কেউ কেউ যেমন ভবিষ্যতে মুসলিম মুখ্যমন্ত্রীর দাবি তুলছেন, তেমনই মুসলিম মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক সক্রিয়তাও এই রাজ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীত ইতিহাস যাঁরা অবহিত আছেন, তাঁরা এইসব ঘটনায় আশঙ্কিতই হবেন।

পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রবেশজনিত সমস্যা নিয়ে ভাবতে গেলে এই আগ্রাসনের রাজনীতিটি দূরে সরিয়ে রাখলে চলবে না। এই আগ্রাসনের রাজনীতিটি ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ৩৭০ ধারা বিলোপ না করে

প্রথমাবধি যে ভুল ভারত সরকার করে এসেছে, এই আগ্রাসনের রাজনীতি অনতিবিলম্বে বন্ধ না করলে দেশের পূর্বপ্রান্তেও ভারত-বিরোধী জেহাদ যে কোনও দিন দেখা দেবে না—সে নিশ্চয়তা নেই। নরেন্দ্র মোদি নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকারে এসেছেন। নরেন্দ্র মোদিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী—যিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই প্রতিশ্রুতি কার্যে পরিণত করাই এবার মোদির কর্তব্য। কাজটি কঠিন—এ অস্বীকার করে লাভ নেই। তবু কঠিন কাজটি মোদিকেই করতে হবে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন জাতীয় নেতা একদিন পশ্চিমবঙ্গকে এই আগ্রাসনের রাজনীতির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি আজ দিল্লির ক্ষমতায় আসীন। পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই তিনি অনুপ্রবেশ প্রশ্নে কঠোর হবেন—মোদির কাছে এমন প্রত্যাশা করাটা নিশ্চয়ই খুব বেশি কিছু নয়।

—রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বর্তমান পত্রিকা, ৩রা জুন ২০১৪

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনে তথাকথিত 'সেকুলার'দের হৃদয় কি ব্যথিত হবে না?

বাংলাদেশে নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর হামলা নেমে এসেছে। সংবাদে প্রকাশ, বাংলাদেশের ৯টি জেলায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ চূড়ান্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ওই সমস্ত জেলাতেই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা ঘরবাড়ি ছেড়ে স্থানীয় মন্দির, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সরকারি অফিসে আশ্রয় নিয়েছেন। আদৌ তাঁরা তাঁদের গৃহে আর ফিরতে পারবেন কি না—তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। সংবাদেই প্রকাশ, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, লালমণিরহাট, গাইবান্ধা, রাজশাহি, চট্টগ্রাম এবং যশোরের বিস্তীর্ণ এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ চলছে। ঢাকা থেকে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে—"বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনা অব্যাহত। বুধবার সকালে নেত্রকোণা জেলায় একটি কালীমন্দিরে তাণ্ডব চালায় বেশ কিছু দুষ্কৃতী। এরপর আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় তাতে।" পিটিআই আরও জানাচ্ছে নির্বাচনের পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই মন্দিরে হামলার ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ওই সূত্রে এও জানা গিয়েছে, নির্যাতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে চলে আসার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর এই নির্যাতনের ঘটনায় যদি অনুপ্রবেশের ঢল নামে, তাহলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের উপর চাপ বাড়বে। আবার ভারতের ভিতর পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং অসমকে এই অনুপ্রবেশের ধাক্কা বেশি সামলাতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই, বাংলাদেশের এই সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ঘটনায় ভারত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবিষয়ে একটি নোট তৈরি করেছে বলে জানা গিয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের কাছে সেই নোটটি পাঠানোও হয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা আরও কঠোর করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর এই হামলার ঘটনা নতুন নয়। বলা যায়, বাংলাদেশ জন্মের আগেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানেই সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর হামলা শুরু হয়। এই বিরতিহীন নির্যাতনের ফলেই বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী অতীতের ৩০ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১২ শতাংশে নেমে এসেছে। আর ক'বছর পর এই হারও যে অনেক কমেই আসবে—তা বলাই যায়। সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর হামলা শুরু করেছে কট্টর

মৌলবাদী জামাত-ই-ইসলাম এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি। বিএনপি জন্মাবধি মৌলবাদ-ঘেঁষা একটি দল এবং জামাতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও নিবিড়। মৌলবাদী জামাতের সমর্থন নিয়ে খালেদা এক সময় বাংলাদেশে সরকারও চালিয়েছেন। সেই ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত—অর্থাৎ, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বর্তমানের বাংলাদেশ—ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশে উগ্র এবং কট্টর মৌলবাদীরা সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর লাগাতার আক্রমণ বজায় রেখেছে একটিই কারণে। কারণটি হল, এই মৌলবাদীরা একটি 'ক্লিনজিং অপারেশন' চালাতে চায় বাংলাদেশে। এরা চায় না—বাংলাদেশে একটি হিন্দু পরিবারেরও অস্তিত্ব থাকুক। আর এই কারণেই এই ধারাবাহিক আক্রমণ। বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর এই নির্যাতন যে শুধুমাত্র সে দেশের পক্ষেই শঙ্কার বিষয়—তা কিন্তু নয়। বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে এর প্রভাব এই উপমহাদেশে, এমনকী সমগ্র বিশ্বে পড়তে বাধ্য। প্রথমত, এর ফলে ভারত সীমান্তে যদি অনুপ্রবেশের ঢল নামে—তাহলে ভারতের অর্থনীতিতে চাপ পড়বে—এ যেমন অনস্বীকার্য; তেমনই বাংলাদেশে এরকমই 'ক্লিনজিং অপারেশন' যদি নির্দ্বিধায় চালিয়ে যেতে থাকে মৌলবাদীরা—তাহলে এই উপমহাদেশে শান্তি এবং সম্প্রীতির পরিস্থিতিটাই নষ্ট হবে। এমনিতেই পাকিস্তানে উগ্র মৌলবাদীরা যথেষ্ট শক্তিশালী, ওই রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রটিকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করে; তদুপরি বাংলাদেশেও যদি মৌলবাদীরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে—তাহলে ভারতের শঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে বৈকি। পাকিস্তানি আই এস আই এবং বাংলাদেশি মৌলবাদীদের প্ররোচনায়, উসকানিতে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ভারতের অভ্যন্তরে মৌলবাদী শক্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করবে—এমন ঝুঁকি থেকেই যায়।

বাংলাদেশে এই সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ ভাবে উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার রয়েছে। প্রথমত, ধর্মের বিচারে না গিয়েও বলতেই হয়—যারা বাংলাদেশে নির্যাতিত হচ্ছে—তারা জাতিগতভাবে বাঙালি। বাঙালির নির্যাতনে বাঙালির উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক ছিল। দ্বিতীয়ত, মৌলবাদীদের আক্রমণে সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারগুলি যদি পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে চায়, তাদের প্রথম ঠিকানা হবে পশ্চিমবঙ্গই। সেক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের ধাক্কা সবথেকে বেশি সামলাতে হবে পশ্চিমবঙ্গকে। এক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ, এরাজ্যের প্রশাসন বা প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলি—কেউই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু গোষ্ঠীর উপর মৌলবাদীদের হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন নয়। বলা ভালো, কোনও উদ্বেগ তারা প্রকাশ করেনি কোনওদিন। ১৯৪৭-এর পরবর্তী সময় থেকে বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠী নানাভাবে নিপীড়িত হলেও, এপারের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীসমাজ বা রাজনৈতিক শক্তিগুলি এনিয়ে কখনও মুখ ফুটে রা-টি কাড়েনি। বরং, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় উদাসীন থেকে অতীতে পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশকে কেন্দ্র

করে এক চপল আবেগ এরা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে বরাবর। এদের এই আবেগী চর্চায় সত্যটি বরাবরই চাপা পড়ে থেকেছে।

ওপারের হিন্দুরা নির্যাতিত হলে এপারের এই নীরবতার প্রকৃত রহস্যটি কী? রহস্যটি আর কিছুই নয়। তথাকথিত সেকুলার সেজে থাকার যে অসুখ সেই ব্রিটিশ-ভারতের সময় থেকে শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজকে গ্রাস করেছিল—অদ্যাবধি তা থেকে তাদের মুক্তি ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর একটি প্রবন্ধে অতীব সুন্দর একটি বিশ্লেষণ করেছিলেন। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী লিখেছিলেন—ব্রিটিশের আগেও ভারত মুসলমান শাসকদের অধীনে ছিল। কিন্তু তখনও হিন্দু সম্প্রদায়কে তাদের ধর্মভাবনা থেকে বিচ্যুত করতে পারেননি মুসলমান শাসকরা। ব্রিটিশশাসক কিন্তু হিন্দুসমাজের শিক্ষিত অংশকে হিন্দুত্ব সম্পর্কে বিমুখ করে তুলতে পেরেছিল। এই শিক্ষিত বাঙালি সমাজ এবং তাদের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক শক্তিগুলি এই ভ্রান্ত সেকুলারিজমের বশবর্তী হয়েই বরাবর সংখ্যালঘু তোষণটিকেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলে বাজারে চালাতে চেয়েছে। এরা মনে করেছে, বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুদের পক্ষে সরব হলে বোধকরি এদেশের সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজ ক্ষুণ্ণ হবে। এক্ষেত্রেও এক ভ্রান্তির বশবর্তী হয়েছে তারা। কিছু মৌলবাদী সংগঠন, কয়েকজন উগ্র মৌলবাদী মুসলিম নেতাকেই এরা মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি মনে করছে। এই মৌলবাদী সংগঠনগুলি বা মৌলবাদী নেতারা যে সমগ্র মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি নয়— এ বোধটাই এপারের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজ বা রাজনৈতিক শক্তিগুলির হয়নি। এই বোধ হয়নি বলেই, কলকাতার মতো শহরে মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনকে জনসভা করার অনুমতি দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না প্রশাসন।

পরন্তু, হিন্দু হিসাবে নিজেদের পরিচয় না দিতে চাওয়ার অহেতুক লজ্জা এপারের হিন্দু বুদ্ধিজীবী সমাজকে অনেকদিন পূর্বেই গ্রাস করেছে। যে কারণে লেবাননে, ইরাকে, ইরানে, আফগানিস্তানে মানুষ গৃহহীন হলে, দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত হলে এরা শোকপ্রকাশে যত তৎপর হয়, প্রতিবাদে যত মুখর হয়; বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত হলে তারা তা হয় না। বরং, বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটিকে তারা বর্জনীয় এবং নিন্দনীয় বলেই মনে করে। এপারের শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী এবং প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলির এই ধরনের অসৎ মানসিকতার কারণেই বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুরা এপার থেকে আজ পর্যন্ত কোনও সহানুভূতি পাননি।

প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু উৎখাতে যদি মৌলবাদীরা 'ক্লিনজিং অপারেশন' চালায়; দশকের পর দশক ধরে বাংলাদেশে যদি হিন্দু সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হতে থাকে—তাহলে বিশ্বদরবারে তার প্রতিবাদ হবে না কেন? কেনই বা হিন্দুদের উপর এই অত্যাচারের প্রতিবাদে অন্তত হিন্দুসমাজ সরব হবে না? হিন্দুসমাজ যদি সরবই

হয়—তাতে অন্যায়ের সত্যই কি কিছু আছে? এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ অবশ্যই টানা যেতে পারে। গুজরাত দাঙ্গাপরবর্তী সময়ে সেই ঘটনার নিন্দায় এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন এবং মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সরব হয়েছিলেন। সেদিন কিন্তু তাদের সেই ভূমিকা নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন তোলেনি। প্রশ্ন তোলা বাঞ্ছনীয়ও হত না। তেমনই আজ যদি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুনির্যাতনের প্রতিবাদে হিন্দুসমাজের ভিতর আলোড়ন ওঠে, হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সে ঘটনার নিন্দায় সরব হন—তাহলে তাও নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। গুজরাত দাঙ্গার নিন্দা করে যদি মুসলিম বিশিষ্ট জনেরা 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা না পান; আশা করা যায়—হিন্দু নির্যাতনের নিন্দা করে হিন্দু সমাজের বিশিষ্টরাও 'সাম্প্রদায়িক' তকমা পাবেন না। আসলে, হিন্দুসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভিতর থেকে একটি প্রতিবাদ আসা উচিত ছিল। দুঃখের—তা আসেনি। কেন আসেনি তার কারণ পূর্বেই বলেছি। শিক্ষিত হিন্দুসমাজ নিজের হিন্দুপরিচয়ে অযথা লজ্জিত হতে শিখেছে। অথচ, হিন্দুত্ব বিষয়টি লজ্জার নয়। তা বুঝেছিলেন সিস্টার নিবেদিতার মতো বিদেশিনীও। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ১৮৯৯ সালে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় নিবেদিতা লিখেছিলেন—''হিন্দুত্ব একটি উদার ধর্মভাবনা। যা বিশাল বৃক্ষের মতো সকলকে আশ্রয় দেয়। প্রাচ্যের এই উদার হিন্দু দর্শনের কাছে পাশ্চাত্যের শিক্ষণীয় অনেক কিছুই আছে।"

মনে রাখতে হবে, ভারত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদেরই দেশ। হিন্দুধর্মের ঔদার্যই ভারতের ধর্ম এবং সমাজ ভাবনার মূল ভিত্তি। একথাও স্বীকার করতে হবে—ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্ম দুটিই বাইরে থেকে ভারতে এসেছে। ভারতের মাটিতে ওই দুটি ধর্মভাবনার জন্ম হয়নি। এই উদার হিন্দুদর্শন ভারতের মূল ভিত্তি বলেই এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অত্যাচারিত হয়ে দেশত্যাগ করতে হয় না। হিন্দুদর্শন তার ঔদার্যের কারণেই, কখনও অন্য ধর্মের প্রতি আগ্রাসী হয় না। এই দর্শনটিকে বুঝলে নিজের হিন্দুপরিচয়ে অযথা লজ্জিত হওয়ার কারণ ঘটে না।

বাংলাদেশের অত্যাচারিত সংখ্যলঘু হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা একটি মানবিক কর্তব্য। শুধু হিন্দুসমাজ নয়, সমাজের প্রত্যেক স্তরের ভিতর থেকে দাবি উঠুক, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষা করতে প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংঘ হস্তক্ষেপ করুক। বাংলাদেশে এবং বিশ্বের অন্যত্রও উগ্র মৌলবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে এক প্রবল জনমত গড়ে উঠুক। আগামীদিনে এই কট্টর, অন্ধ মৌলবাদই যে মানবসভ্যতার বড় বিপদ—এ বোধ জাগ্রত হোক সকলের হৃদয়ে।

আর, বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুর যন্ত্রণায় ধর্মমতনির্বিশেষে সমগ্র মানবহৃদয় একবার অন্তত আলোড়িত হোক। ব্যথিত হোক।

—রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বর্তমান পত্রিকা, ১৪ই জানুয়ারি ২০১৪

অনুপ্রবেশকারী দূর করতে মোদি কি কঠোর হতে পারবেন?

প্রাক্ নির্বাচনী প্রচারপর্বে এই রাজ্যে এসে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি বলেছিলেন, দিল্লির ক্ষমতায় এলে এ রাজ্য থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের তিনি বিতাড়ন করবেন। মোদির এই বক্তব্যের পর, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস, দুই বিরোধী শক্তি বাম ও কংগ্রেস এবং এ রাজ্যের তথাকথিত সেকুলারপন্থী বুদ্ধিজীবীরা মোদির বিরোধিতায় সরব হয়েছিলেন। শাসক দলের সুপ্রিমো এ প্রশ্নে মোদিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন—এই রাজ্য থেকে একজনকেও বিতাড়িত করতে তিনি দেবেন না। মোদির এই বক্তব্যের একটি অপব্যাখ্যা করে কোনও কোনও মহল থেকে এমনও বলা হয়েছিল, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর উদ্বাস্তু হয়ে যে হিন্দু পরিবারগুলি এদেশে চলে এসেছিল, মোদির এ ফরমানের পর তাদেরও পাততাড়ি গুটোতে হতে পারে। এইসব সমালোচনা মোদিকে অবশ্য তাঁর বক্তব্য থেকে তিলমাত্র সরাতে পারেনি। বরং, এরপরও প্রাক্-নির্বাচনী জনসভায় এসে তিনি বলে গিয়েছেন, ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো হবে তাঁর অন্যতম অ্যাজেন্ডা। নির্বাচন পর্ব এবার সমাধা হয়েছে। নিরঙ্কুশ আধিপত্য নিয়ে মোদির নেতৃত্বাধীন এন ডি এ ক্ষমতায় এসেছে। ১৯৮৪ সালের পর এই প্রথম কেন্দ্রে কোনও দল তার নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল। আর অস্বীকার করে লাভ নেই, এটা সম্ভব হয়েছে প্রবল মোদি-ঝড়ের কারণে। অটলবিহারী বাজপেয়ির যে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল, সেই লক্ষ্যমাত্রাকে মোদি যেন স্পর্শ করেছেন অনায়াসে। সেদিক দিয়ে দেখলে, ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি এরপর থেকে রেকর্ড সৃষ্টিকারী এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের যে কথা নরেন্দ্র মোদি বলছেন, তাকে অনেকেই মোদির ব্যক্তিগত হুঙ্কার বলে চিহ্নিত করতে চাইছেন। বিষয়টি কিন্তু মোটেই তা নয়। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের প্রসঙ্গটি বি জে পি'র একটি পুরনো অ্যাজেন্ডা। বরাবরই বি জে পি এই দাবি তুলে এসেছে। এবারও নির্বাচনী ইস্তেহারে বি জে পি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, ক্ষমতায় এলে তারা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করবে। কাজেই, এটিকে মোদির ব্যক্তিগত হুঙ্কার বলে ভাবার কোনও কারণ নেই। বরং বি জে পি'র এই বক্তব্যই মোদি আবার নতুন করে বলেছেন। এবং জোরের সঙ্গে বলেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মোদি এই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন

করতে পারবেন কি না? নাকি, আর পাঁচজন রাজনীতিবিদ নির্বাচনের আগে যেমন নানাবিধ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে, পরে তা যথাযথ পালন করতে অসমর্থ হন, সেরকমই মোদি করবেন? এখানেও একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। অটলবিহারী বাজপেয়ির মতো সুউচ্চ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সঙ্গী করে নয়। বরং, শরিকদের ওপর নির্ভর করেই বাজপেয়িকে পাঁচ বছর সরকার চালাতে হয়েছিল। আর এই শরিক নির্ভরতার কারণে, বাজপেয়ির নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার ইচ্ছা থাকলেও অনেক প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেনি। বরং, শরিকদের নানাবিধ ব্ল্যাকমেল বাজপেয়িকে পদে পদে বাধাই দিয়েছে। নরেন্দ্র মোদির এই সমস্যাটি নেই। বরং, মোদি নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকারে এসেছেন। কোনও ব্ল্যাকমেলিংয়ের কাছে মাথা নত করে তাঁকে অন্তত চলতে হবে না। এদিক দিয়ে, বাজপেয়ির থেকে মোদির কাজ অনেক সহজ। মোদি তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলি পালনে অন্তত কোনও বাধার সম্মুখীন হবেন না। সরকারের ওপর এইরকম আধিপত্য নিয়ে আসার পর কি মোদি সত্যি সত্যিই অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারবেন? নাকি, তাঁকেও তোষণের রাজনীতি পিছন থেকে টেনে ধরবে? নরেন্দ্র মোদি সরকারে আসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইরকম নানাবিধ প্রশ্ন তাঁকে কেন্দ্র করে উঠবে।

প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার আগে একটু দেখে নেওয়া যাক, অনুপ্রবেশকারী বলতে মোদি ঠিক কাদের বুঝিয়েছেন। মোদির বিরোধিতা যাঁরা করছেন, তাঁরা অন্তত অনুপ্রবেশকারীর সঠিক সংজ্ঞাটি জানেন না। বা, জানলেও, নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁরা বিষয়টির বিকৃত ব্যাখ্যা করতে থাকেন। এক্ষেত্রে, রাষ্ট্রসংঘ উদ্বাস্তু বা শরণার্থীর যে সংজ্ঞাটি দিয়েছে, তা একটু জেনে নিলে আলোচনা করতে সুবিধা হয়। ১৯৫১-য় রাষ্ট্রসংঘের কনভেনশনে শরণার্থীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে— 'যে ব্যক্তির জাতি, ধর্ম, নাগরিকত্ব বা কোনও সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্থার সভ্য হওয়ার কারণে নিপীড়িত হওয়ার যথেষ্ট উপযুক্ত আশঙ্কা রয়েছে বলে তাঁর নাগরিকত্ব যে দেশের সেই দেশের বাইরে রয়েছেন এবং ফিরতে পারছেন না বা এই ভীতির জন্য ফিরতে ইচ্ছুক নন।' ১৯৬৭ সালে এটি প্রোটোকলে সংশোধিত হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকে এই পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং অধুনা বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দু পরিবারগুলি অত্যাচারিত হয়ে চলে এসেছিল, বা, এখনও আসছে—তারা উদ্বাস্তু বা শরণার্থী। মোদির বক্তব্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করে যাঁরা এদেরও 'অনুপ্রবেশকারী' বলে শোরগোল তুলে দিতে চাইছেন, প্রকৃত তথ্যটা কিন্তু তা নয়। দেশভাগের সময় যে হিন্দু পরিবারগুলি এদেশে চলে এসেছিল, তাদের এদেশে প্রবেশ করার সময় একটি রিসিট দেওয়া হয়েছিল। যার ভিত্তিতে এদের পরবর্তীকালে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। ১৯৭১-এর মার্চের পর যে হিন্দু পরিবারগুলি অত্যাচারিত হয়ে এদেশে চলে এসেছে, তাদের বলা হচ্ছে 'অস্বীকৃত শরণার্থী'। দেশভাগ

পরবর্তী সময় থেকে এ পর্যন্ত এদেশে চলে আসা অত্যাচারিত হিন্দুদের বিতাড়নের কথা মোদি বা বি জে পি বলেননি। বরং, এই শরণার্থীদের নাগরিকত্ব এবং আশ্রয় দেওয়ার কথাই মোদি এবং বি জে পি বারবারই বলেছেন। বিজেপি'র এবারের নির্বাচনী ইস্তাহারেও এদের সসম্মানে এদেশে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাহলে, 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' বলতে মোদি কাদের বুঝিয়েছেন? রাষ্ট্রসংঘের সংজ্ঞা মানলে, অনুপ্রবেশকারী তারাই, যারা নিজেদের দেশে অত্যাচারিত বা নিপীড়িত হয়ে নয়, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে অন্য দেশে প্রবেশ করছে এবং পাকাপাকিভাবে সেদেশে বসবাস করছে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, অনুপ্রবেশকারীদের তালিকায় পড়েছে বাংলাদেশি মুসলিমরা, যারা নিজেদের দেশে মোটেই অত্যাচারিত বা নিপীড়িত নয়। বরং অন্য কোনও উদ্দেশ্যে যারা এদেশে প্রবেশ করে পাকাপাকিভাবে এদেশে বসবাস করার চেষ্টা করছে। এই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদেরই মোদি বিতাড়নের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে এটিও মনে রাখা দরকার—মোদি বিতাড়নের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে এটিও মনে রাখা দরকার—মোদি কিন্তু একবারও ভারতীয় মুসলিমদের বিতাড়নের কথা বলেননি।

অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের প্রসঙ্গে কোনও দেশই, এমনকী পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলিও, কখনওই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের রেয়াত করে না। বরং, প্রতিটি দেশেই অনুপ্রবেশকারীদের পুশ ব্যাক করাই রীতি। এমনকী, আমাদের পার্শ্ববর্তী দুটি রাষ্ট্র—পাকিস্তান এবং বাংলাদেশও কখনও কোনও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীকে তাদের দেশে খাতির করে না। বরং, সেক্ষেত্রে ধরা পড়লে সেই ভারতীয়র কপালে মৃত্যুদণ্ডের মতো নির্মম সাজাই অনেক ক্ষেত্রে ধার্য হয়। যাঁরা অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের প্রশ্নে মোদিকে 'সাম্প্রদায়িক এবং বিদ্বেষমূলক' আখ্যা দিচ্ছেন—তাঁরা কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রসঙ্গে একেবারেই নীরব। আসলে, অনুপ্রবেশজনিত সমস্যাগুলির দিকে এখানে তাঁরা একবারও দৃষ্টিপাত করছেন না। অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি বিভিন্ন দেশ কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি নেয় মূলত দু-তিনটি কারণে। প্রথমত, অবাধ অনুপ্রবেশ একটি দেশের অর্থনীতির ওপর চাপ এবং বোঝা বাড়াতে থাকে। দ্বিতীয়ত, অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে, একটি দেশের বা একটি অঞ্চলের গোষ্ঠীবিন্যাস এবং সামাজিক চিত্র দ্রুত বদলে যেতে থাকে। এবং তৃতীয়ত, এর ফলে রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভারসাম্যও নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ভারত, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশজনিত এই সবকটি সমস্যাই দশকের পর দশক ধরে ক্রমাগতই প্রকট হয়েছে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এই রাজ্যে কী ভয়াবহ আকার নিয়েছে, তা সংসদে এবং অন্যত্র দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিবৃতিতেই বোঝা যায়। ২০০৪ সালে লোকসভায় তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল জানিয়েছিলেন, ভারতে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫০ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আছেন। তারও আগে, ১৯৯০-তে কমিউনিস্ট নেতা এবং

তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত সংসদে বলেছিলেন, ভারতে প্রায় এক কোটি বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। আর প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সি পি এমের মুখপত্র গণশক্তিতে ১৯৯২ সালের ১১ অক্টোবর লিখেছিলেন, '১৯৭১ থেকে মুসলমানরা ভারতে আসতে শুরু করল। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বি এস এফ ২,৩৫,৫২৯ জন বাংলাদেশিকে শনাক্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৬৮, ৪৭২ জন হিন্দু আর ১,৬৪,১৩২ জন মুসলমান। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত মোবাইল টাস্ক ফোর্স ২,১৬,৯৮৫ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৫৬,৩৪২ জন হিন্দু ও ১,৬৯,৭৯৫ জন মুসলমান।' জ্যোতি বসুর লেখাতেই প্রমাণ, ওই সময়কালের ভিতর যত বাংলাদেশিকে বিতাড়ন করা হয়েছিল তার ৭৫ শতাংশ মুসলমান। এই তিনজনের বক্তব্য এবং লেখা থেকেই অনুপ্রবেশের ভয়াবহতা সহজেই অনুমেয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল এবং জ্যোতি বসু—এই তিনজনই অনুপ্রবেশের ভয়াবহতা এবং অনুপ্রবেশজনিত সমস্যার কথা বোঝাতেই এই তথ্য তুলে দিয়েছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে, মোদি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের কথা বলার অনেক আগেই এই তিন নেতা সমস্যাটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশজনিত স্বাভাবিক সমস্যাগুলি ছাড়াও আরও একটি আশঙ্কার কারণ রয়েছে। এই আশঙ্কার কারণটি রাজনৈতিক। এই রাজনীতিটির সূত্রপাত স্বাধীনতারও পূর্বে এবং এই রাজনীতির লক্ষ্যটিও দুরভিসন্ধিমূলক। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের সমস্যাটি নিয়ে আলোচনার সময় এই রাজনীতির চরিত্রটি বুঝতে হবে। ইতিহাস অনুশীলন করলেই আমরা দেখতে পাব, দেশ বিভাগের বহু পূর্বেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবিতে মুসলিম লিগ এবং তাদের নেতৃত্ব সরব হয়েছিল। সেক্ষেত্রে সমগ্র বাংলা তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ১৯০৫-০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সরিয়ে আনার জন্য দুই বড়লাট, প্রথমে লর্ড কার্জন এবং তারপর লর্ড মিন্টোর প্ররোচনায় প্রিন্স আগা খাঁ এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ নেচে ওঠেন। কার্জন আগা খাঁ এবং সলিমুল্লাহকে মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে সরিয়ে আনতে সফল হয়েছিলেন। আগা খান এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম লিগ গঠন করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে বিনষ্ট করে দেওয়ার চক্রান্তে শামিল হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সলিমুল্লাহর উসকানিতে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে ব্যাপক দাঙ্গা হয়েছিল। সে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের হিন্দু জনগোষ্ঠী। এরপর ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে মুসলিম লিগের অধিবেশনে আবার মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য ভারতের বাইরে অথবা ভারতের ভিতরই স্বতন্ত্র বাসভূমি গঠনের দাবি ওঠে। এদেশের তথাকথিত সেকুলারপন্থীরা যাঁকে 'ভারতপ্রেমিক' আখ্যায় ভূষিত করেছে, সেই উর্দু কবি ইকবাল

স্বয়ং এলাবাবাদ সম্মেলনে মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশের দাবিতে সরব হয়েছিলেন। সভাপতির ভাষণে ইকবাল বলেছিলেন—

'I would like to see Punjab, North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan amalgamated into a single state. Self government with the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-West Indian Muslim State appears to me to be the final destiny of the Muslims at least of North-West India.' দেখা যাচ্ছে 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা'র কবি নিজেই অবিভক্ত ভারতেই পাকিস্তানের ব্লু প্রিন্ট রচনা করে গিয়েছিলেন। বোঝাই যায়, খাতায়-কলমে ভারত ভাগ হওয়ার অনেক আগে থেকেই ভারত ভাগের ছক কষতে শুরু করেছিলেন লিগ নেতারা।

এই মানসিকতাই ক্রমে আরও প্রকট হয়ে উঠে সরাসরি পাকিস্তানের দাবি উঠে আসে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-র মুখে। এবং ভারত ভাগের দাবিতে কতখানি উগ্র তিনি হতে পারেন, তা জিন্নাহ্ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ১৯৪৬ সালে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়ে। জিন্নাহ্ বলেছিলেন 'Now the time has come for the Muslim Nation to resort to direct action, I am not prepared to discuss ethics. We have a pistol and are in position to use it.' জিন্নাহ্-র এই বক্তব্যের ফলশ্রুতি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস। যা যে কোনও সভ্য মানুষকেই লজ্জা দেবে। জিন্নাহ্-র হুমকির মর্মার্থ সেদিন হিন্দু জনগোষ্ঠী বুঝতে পারেনি। ফলে তারা সতর্কও হয়নি।

মনে রাখতে হবে, পাকিস্তানের দাবি জানাতে গিয়ে জিন্নাহ্ অখণ্ড পাঞ্জাব এবং অখণ্ড বাংলাও দাবি করে বসেছিলেন। পোকায় কাটা পাকিস্তান তিনি চান না— এমনটিই জিন্নাহ্ বলেছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে। জিন্নাহ্-র সে আশা অবশ্য পূর্ণ হয়নি। অখণ্ড পাঞ্জাব এবং অখণ্ড বাংলা জিন্নাহ্ নিয়ে যেতে পারেননি। অখণ্ড বাংলা নিয়ে যেতে পারবেন না এটি উপলব্ধি করে জিন্নাহ্ এবং ক্যালকাটা কিলিংস-এর নায়ক শহিদ সোহরাবর্দি একটি শেষ খেলা খেলেছিলেন। সোহরাবর্দিকে দিয়ে স্বাধীন যুক্তবঙ্গের দাবি তুলিয়ে দিয়েছিলেন জিন্নাহ্। আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে সোহরাবর্দির এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বসেছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। জিন্নাহ্-র চালটিই ছিল স্বাধীন যুক্তবঙ্গকে যদি ভারত থেকে আলাদা করে আনা যায়, তাহলে পরবর্তী সময়ে ছলে বলে কৌশলে অথবা গায়ের জোরে একে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যাবে। কিন্তু জিন্নাহ্-র শাসনে বা জিন্নাহ-র স্বপ্নের পাকিস্তানে যে হিন্দু জনগোষ্ঠী বিপন্ন হয়ে পড়বে, তা বুঝেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো জাতীয় নেতা। কেননা, হিন্দুদের প্রতি জিন্নাহ্-র ঘৃণা এবং বিদ্বেষ বুঝতে শ্যামাপ্রসাদের বিলম্ব হয়নি। হিন্দুদের প্রতি জিন্নাহ্-র কী হীনদৃষ্টি ছিল তা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন লর্ড ইজমে— 'The dominating feature in Mr. Jinnah's mental structure was his loathing and contempt of Hindus. He apparently thought that all Hindus

were sub human creatures with whom it was impossible for the Muslim to live.'

শ্যামাপ্রসাদ যে কতটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তা বোঝা যাবে, পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান এবং পরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায়। দেশভাগ পর্বে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, জওহরলাল নেহরু এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশের পশ্চিমপ্রান্তে পাঞ্জাবের সমস্যা নিয়ে যতটা মনোযোগী ছিলেন, দেশের পূর্বপ্রান্তে বাংলার সমস্যা নিয়ে ততটা মনোযোগী আদৌ ছিলেন না। দেশভাগের প্রাক্ মুহূর্তে দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে গিয়ে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পূর্ববঙ্গের অত্যাচারিত হিন্দু পরিবারগুলিকে ওই দেশেই থেকে আসার পরামর্শ দিয়ে এসেছিলেন। ওদেশে তাদের যে কোনোই নিরাপত্তা নেই, এবং জিন্নাহ্-র পাকিস্তানে তারা যে আরোই নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়বে— এই বাস্তবটি 'মহাত্মা' বুঝতেই চাননি। দেশভাগ পর্বে পাঞ্জাবে শরণার্থী বিনিময়ে যতটা আগ্রহ নেহরু দেখিয়েছিলেন, ততটা আগ্রহ পূর্ববঙ্গের হিন্দু শরণার্থীদের প্রতি দেখাননি নেহরু। এই রকম একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মূলত শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টাতেই হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রয়োজনে বাংলাকে ভাগ করা হয়েছিল। জন্ম হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের। এই ইতিহাসটি মনে রাখলে এটি বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, হিন্দু-বিরোধী জিন্নাহ্-র পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতেই তাদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু স্বাধীনতার পরেও পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সমস্যা অনুধাবন করতে এবং তাদের শরণার্থীর মর্যাদা দিতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু। ১৯৫০-এ পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্মম এবং নারকীয় হামলার পর নেহরু তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলিকে ভারতে আমন্ত্রণ জানান। সেই সময় দুই প্রধানমন্ত্রীর ভিতর একটি চুক্তিও হয়। চুক্তিটি 'নেহরু-লিয়াকত' চুক্তি নামে পরিচিত। ওই চুক্তিতে বলা হয়েছিল—(১) দুই দেশের সরকারই নিজ নিজ দেশে সংখ্যালঘুদের যাবতীয় নিরাপত্তা বিধান করবে, (২) যাঁরা অত্যাচারিত হয়ে দেশ ছেড়েছেন, তাঁদের নিজ দেশে ফিরে যেতে উৎসাহ দেওয়া হবে এবং (৩) একান্তই যাঁরা দেশত্যাগ করতে চাইবেন, তাঁদের সেই সুযোগ দেওয়া হবে এবং তাঁরা যত খুশি অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে যেতে পারবেন। ১৯৫০-এর আগস্ট মাসে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি নিয়ে সংসদে দীর্ঘ আলোচনা হয়। ওই সময় উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাব ছিল—দু দেশের ভিতরই সংখ্যালঘু বিনিময় করা হোক। নেহরু অবশ্য সে প্রস্তাবে সায় দেননি। সেই সময় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়সহ চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ প্রতিবাদে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগও করেছিলেন।

এই রাজনৈতিক ইতিহাসটি এই কারণেই বর্ণনা করলাম যে, বাংলা ভাগ হলেও ঘুরপথে জিন্নাহ্ প্রদর্শিত সেই আগ্রাসনের রাজনীতি বাংলার মাটি থেকে দূর হয়নি। সেটি বোঝা যাবে দেশভাগ পরবর্তী সময় থেকে এই পর্যন্ত বাংলাদেশে হিন্দু নিধন, হিন্দু বিতাড়ন এবং পাশাপাশি এই বাংলায় মুসলিম অনুপ্রবেশকারীর আকাশছোঁয়া বৃদ্ধির ভিতর। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ। এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৮ শতাংশ। হিন্দু জনসংখ্যার এই ব্যাপক হ্রাসের কারণ, সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, নিধন এবং তজ্জনিত কারণে তাদের দেশ ত্যাগ। একে সোজা কথায় বলা যায় 'এথনিক ক্লিনজিং'। এরই পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের দিকে দেখুন। ১৯৫১-র জনগণনা অনুযায়ী এ রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ১৯.৮৫ শতাংশ। বর্তমানে তা ৩১ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ বৃদ্ধির শতাংশ হার তিনশো'রও বেশি। আরও মনে রাখতে হবে, এই মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুধু রাজ্যে মুসলিম ভোটারই বৃদ্ধি করেছে তা নয়। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে নির্বাচনী এলাকাও বৃদ্ধি করেছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিধানসভা কেন্দ্রগুলির এলাকা পুনর্বিন্যাস হওয়ার ফলে কলকাতার বিধানসভা কেন্দ্র ২১ থেকে কমে ১১ হয়েছে। পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হিন্দু প্রধান অঞ্চলে কমেছে দুটি করে কেন্দ্র, বর্ধমান, হুগলি ও বীরভূমে একটি করে। আর বিধানসভা এলাকা বেড়েছে সীমান্তের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল মুর্শিদাবাদে ৩টি, উত্তর দিনাজপুর ও নদীয়ায় ২টি করে, মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে একটি করে। বোঝাই যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক বিন্যাস কেমনভাবে বদলে যাচ্ছে। এই বদল যে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক-সামাজিক ভারসাম্যে আঘাত হানবে না— এরকম নিশ্চয়তা-কিন্তু নেই। এই আশঙ্কা এই কারণে হয় যে, ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম লিগের রাজনীতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন কেউ কেউ। এই রাজ্যেই সম্প্রতি মুসলিম মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির রমরমা যেমন বেড়েছে, তেমনই 'সেকুলার' সাজার আড়ালে কেউ কেউ ভবিষ্যতে মুসলিম মুখ্যমন্ত্রীর দাবিও তুলছেন।

পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রবেশজনিত সমস্যা নিয়ে ভাবতে গেলে এই বিষয়টিকে দূরে সরিয়ে রেখে ভাবলে চলবে না। বরং, এই বিযয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করলে এবং এর গূঢ় কারণগুলিকে বোঝার চেষ্টা করলে অনুপ্রবেশকারী বিতাড়ন কেন জরুরি—তা বুঝতে অসুবিধা হবে না। এও বুঝতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্যাটি তার একার সমস্যা নয়। বরং এই সমস্যা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকলে তা একসময় সমগ্র ভারতের নিরাপত্তা এবং অখণ্ডতার পক্ষেই আশঙ্কার হয়ে দাঁড়াবে। নতুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি প্রাক্-নির্বাচনী প্রচারে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময় আশা করাই যায় যে, তিনি এই সমস্যাটিকে সম্যক অনুধাবন করেই এই কথা বলেছেন। সম্যক অনুধাবন যদি করেই

থাকেন, তাহলে মোদি এ সমস্যা সমাধানে কঠোর এবং কঠিন পদক্ষেপ করবেন—এমনটি আশা করাই যায়।

কংগ্রেসের তোষণের রাজনীতি যে দেশের স্বার্থ রক্ষা করবে না বরং তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে, তা বুঝেছিলেন বাবাসাহেব আম্বেদকর। আম্বেদকর বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় কংগ্রেস দুটো জিনিস বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমত তোষণ ও নিষ্পত্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ব্যর্থতা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোষণের অর্থ হল, যেসব আক্রমণকারী নির্দোষ ও নিরীহ মানুষদের উপর খুন, ধর্ষণ, লুঠ এবং অগ্নি সংযোগের মতো কার্যকলাপে অভ্যস্ত তাদের দোষ উপেক্ষা করে তাদের উৎকোচ দিয়ে বশে রাখা। অপর পক্ষে নিষ্পত্তির অর্থ হল একটি সীমারেখা টেনে দেওয়া যা কোনও পক্ষই অতিক্রম করতে পারবে না। তোষণ আক্রমণকারীর দাবি ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি কোনও সীমারেখা স্থাপন করে না। নিষ্পত্তি তা করে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস এই কথাটি বুঝতে অসমর্থ যে সুবিধাদানের নীতি মুসলমানদের আক্রমণাত্মক মনোভাব বাড়িয়ে দিয়েছে এবং যা সবচেয়ে খারাপ তা হল মুসলমানরা এইসব সুবিধাদানকে হিন্দুদের পরাজয় বরণের মানসিকতা এবং বাধা দেওয়ার শক্তির অভাব বলে ব্যাখ্যা করে। এই তোষণ নীতি হিন্দুদেরই এক ভয়াবহ অবস্থায় ফেলবে যা হিটলারের প্রতি তোষণের নীতির পরিণাম হিসাবে মিত্রশক্তিকে ভোগ করতে হয়েছিল।' এই একই কথা অবশ্য এ দেশের বামপন্থী, সমাজবাদী, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক শক্তিগুলির প্রতিও খাটে। এখন এটাও লক্ষ করার বিষয় যে, নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদিও শেষ পর্যন্ত তোষণের রাজনীতির কাছেই আত্মসমর্পণ করেন, নাকি অনুপ্রবেশকারী প্রশ্নে কঠোর পদক্ষেপ করে দেশকে সমস্যামুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যান। একটি আশার কথা, অনুপ্রবেশ সমস্যা দূর করতে একটি পৃথক দপ্তর চালু করার কথা ইতিমধ্যেই ভেবেছেন মোদি। মনে রাখতে হবে, এর আগে কেন্দ্রে অটলবিহারী বাজপেয়ি এবং দিল্লি রাজ্যে বি জে পি সরকার পাঁচবছর ক্ষমতায় ছিল। বি জে পি'র দাবি মতোই দিল্লিতে তিন লক্ষেরও বেশি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে কিন্তু তারা বিতাড়ন করতে পারেনি। এবার দেখার, যে কাজ বাজপেয়ি করতে পারেননি, সেটা নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি পারেন কি না। তোষণের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে তিনি ভারতকে সুস্থ রাজনীতির পথ দেখাতে পারেন কি না। যদি দেখাতে পারেন, তাহলে তিনি সত্যিই ভারতীয় রাজনীতিতে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

রন্তিদেব সেনগুপ্ত—
সাপ্তাহিক বর্তমান, ৭ই জুন ২০১৪

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ কেন জরুরি, তা দেশবাসীকে বোঝাক বিজেপি

কাশ্মীর প্রসঙ্গে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ এবং দেশব্যাপী অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু—ভারতীয় জনতা পার্টির এই দাবি দীর্ঘদিনের। এই দাবির পক্ষে এবং বিপক্ষে বিতর্কও কিছু কম হয়নি। এর আগে অটলবিহারী বাজপেয়ির নেতৃত্বে কেন্দ্রে যখন বিজেপি ক্ষমতায় এসেছিল—তখন এই দাবি পূরণে তারা কিছুই করতে পারেনি। করার ক্ষমতাও অবশ্য তাদের তখন ছিল না। বাজপেয়ি ক্ষমতায় এসেছিলেন শরিক নির্ভর হয়ে। সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপে বাজপেয়ির শরিকরা কখনওই রাজি হত না। ফলে, সেই সময় ক্ষমতায় এসেও বিজেপিকে বাধ্য হয়েই এই অ্যাজেন্ডাটি দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। তবে দূরে সরিয়ে রাখলেও, অ্যাজেন্ডাটিকে বিজেপি কখনও পরিত্যাগ করেনি। স্বাভাবিকভাবেই, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে লোকসভায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে আসার পর এবার এই প্রশ্নটি উঠবে—কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের প্রসঙ্গে এবার বিজেপি কী করবে? নরেন্দ্র মোদি শরিক-নির্ভর হয়ে ক্ষমতায় আসেননি। একক-ক্ষমতাতেই তিনি বলীয়ান। ফলে, অনেক ক্ষেত্রেই শরিকদের তুষ্ট রাখতে বাজপেয়ির মতো তাঁকে চার-পা এগিয়ে দু-পা পিছিয়ে আসতে হবে না। তবু ৩৭০ ধারা বিলোপের প্রশ্নে নরেন্দ্র মোদি সাত তাড়াতাড়ি কোনও পদক্ষেপ করতে পারবেন বলে মনে হয় না। তার কারণ লোকসভায় বিজেপি নিরঙ্কুশ-গরিষ্ঠ হলেও রাজ্যসভায় বিজেপির গরিষ্ঠতা এখনও নেই। কাজেই এমন আশঙ্কা করাই যায়, রাজ্যসভায় মোদিকে পদে-পদে কংগ্রেস এবং অন্য বিরোধীদের বাধার সম্মুখীন হতেই হবে। আর ৩৭০ ধারা বিলোপের প্রশ্নে তুমুল বিরোধিতা যে আসবে—সে বলাই বাহুল্য। তাহলে, বিজেপি কী করতে পারে? বিজেপি একটি কাজ করতে পারে। তা হল, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার কোনও যৌক্তিকতা আছে কি না, ৩৭০ ধারা কাশ্মীরে কাদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করছে এবং সংবিধানে ৩৭০ ধারা সংযুক্ত রাখা দেশের অখণ্ডতার পরিপন্থী কি না—সে প্রসঙ্গে দেশের জনগণকে অবহিত করা। জনমত গড়ে তোলা। সংসদে এবং অন্য রাজনৈতিক দলগুলির উপর জনমত গঠন করে একটি চাপ সৃষ্টি করা।

কাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে সংবিধানে ৩৭০ ধারা সংযোজন করা হয়েছিল, স্বাধীনতার ছ'দশক পরেও কাশ্মীরে এই ধারাটি চালু রাখার যৌক্তিকতা আছে

কি না; বা, দেশের অখণ্ডতার পক্ষে কতখানি হানিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে এটি— তা বোঝার জন্য একটু ঐতিহাসিক পর্যালোচনা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর কাশ্মীর রাজ্যটি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং তখন থেকেই জওহরলাল নেহরু কাশ্মীর প্রসঙ্গটিকে তাঁর ব্যক্তিগত এক্তিয়ারে নিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে মন্ত্রিসভার কোনও সদস্যের সঙ্গেই তিনি কোনওরকম আলোচনা করতেন না। একমাত্র ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা শেখ আবদুল্লাহর সঙ্গে এ-বিষয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন। কাশ্মীর প্রসঙ্গটি নিয়ে এই স্বল্প পরিসরে দীর্ঘ আলোচনা করা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলেও শেখ আবদুল্লাহ প্রথমাবধি কাশ্মীর প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবই দেখিয়ে এসেছিলেন। ভারতের ভিতরে থাকলেও কাশ্মীরের জন্য পৃথক সংবিধান, পৃথক পতাকা, পৃথক দেওয়ানি বিধি এবং আদালত এসবই চেয়েছিলেন শেখ আবদুল্লাহ। এক অর্থে কাশ্মীরকে ভারতের বাকি অংশের থেকে যেন বিচ্ছিন্ন করে রাখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বলাই বাহুল্য, আবদুল্লাহর এই মনোভাব কাশ্মীর সীমান্তের ওপারে পাক প্রশাসক এবং কাশ্মীরের অভ্যন্তরে পাকপন্থীদের উৎসাহিত করেছিল। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে ভারত সরকারের এজেন্ট জেনারেল হিসেবে কাঁওয়ার দলিপ সিংকে জম্মু-কাশ্মীরে পাঠানো হয়েছিল। দলিপ সিং দেখেছিলেন যে, ভারত সরকারের নীতিসমূহকে অগ্রাহ্য করে শেখ আবদুল্লাহ নিজের মতো করে চলছেন। দলিপ সিং বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান। কিন্তু নেহরু দলিপ সিংয়ের মতামতকে অগ্রাহ্য করেন। ফলে পদত্যাগ করেন দলিপ সিং। শেখ আবদুল্লহর এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকর্মের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কাশ্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বিচারপতি মেহেরচাঁদ মহাজন। আবদুল্লাহর এই আচরণ যে জম্মু-কাশ্মীরের প্রতিটি মানুষ মেনে নিয়েছিলেন তা নয়। আবদুল্লাহর কাজকর্মের প্রতিবাদ জানিয়ে জম্মুতে প্রজা পরিষদ ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলন দমন করতে আবদুল্লাহর সরকার নানারকম পীড়ন শুরু করে। বিনা বিচারে বহু মানুষকে আটক করা হয়।

ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েও কাশ্মীরকে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো আলাদা করে রাখতে, বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিতে, এবং সেখানে নিজের পরিবারতন্ত্রকে কায়েম করতে আবদুল্লাহ সংবিধানে ৩৭০ ধারা যুক্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেন। এ-ব্যাপারে তাঁর সহায় হয়েছিল নেহরুর নীরব সম্মতি এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রেরণা ও পাকপন্থীদের মদত। সংবিধানে ৩৭০ ধারা সংযোজনের নীতিগত বিরোধী ছিলেন বাবাসাহেব আম্বেদকরও। সংবিধান সভার সামনে যখন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার এই ধারাটি উপস্থাপন করেন, তখন অনেক সদস্যই আপত্তি জানান। তখন আয়েঙ্গার বলেন, কাশ্মীরের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এই ৩৭০ ধারা সংযোজন করা হয়েছে। কারণ কাশ্মীর এখনও ভারতের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে পুরোপুরি ঠিকঠাক অবস্থায় নেই। সেইসঙ্গে

আয়েঙ্গার এও বলেন, "এটা সকলেই আশা করে যে, যথাসময়ে জম্মু-কাশ্মীরও অন্যান্য রাজ্যগুলির মতো ভারতের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে পুরোপুরি ঠিকঠাক অবস্থায় চলে আসবে।" এরপরই আবদুল্লাহ কাশ্মীরকে এক স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পাকাপাকি ব্যবস্থা করলেন। প্রচার শুরু করলেন যে, শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমিত বিষয়ে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তি হয়েছে। প্রতিরক্ষা বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকলেও আবদুল্লাহ বলেছিলেন, স্থানীয় কাশ্মীরি সৈনিকদের একটি বাহিনী গঠন করে ভারত সরকার তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিক। সে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কাশ্মীর সরকারের হাতে থাকবে। কতখানি বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন। আবদুল্লাহ এবং তাঁর সতীর্থরা, তা বোঝা যাবে দুটি ঘটনায়। ১৯৫২ সালের ২৪ মার্চ আবদুল্লাহ মন্ত্রিসভার সদস্য মির্জা আফজল বেগ রাজ্যের সংবিধান সভায় বলেন, "ভারতীয় যুক্তরাজ্যের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য একটি গণরাজ্য (প্রজাতন্ত্র) হবে। ....রাজ্যের সংবিধান সম্বন্ধে আমাদের লক্ষ্য হল যে, এর কাঠামোকে এমনভাবে তৈরি করতে চাই যাতে এই রাজ্য অন্য প্রজাতন্ত্র রাজ্যের মতো একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হবে। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজ্যের নিজস্ব প্রেসিডেন্ট, পৃথক জাতীয় পতাকা এবং বিচার ব্যবস্থা থাকবে।" আর শেখ আবদুল্লাহ? ২৯ মার্চ সংবিধান সভায় শেখ আবদুল্লাহ স্বয়ং বলেন যে, "আমরা একশো শতাংশ সার্বভৌম সত্তা। আমাদের প্রগতির পথে কোনও দেশই বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। ভারতীয় সংসদ অথবা এই রাজ্যের বাইরে কোনও সংসদেরই আমাদের উপর আইনগত অধিকার নেই।" এরপর আর বলে দিতে হয় না, শেখ আবদুল্লাহর রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপটি কী ছিল। ১৯৫২-র ২৪ জুলাই, কার্যত নেহরুর পরোক্ষ সহায়তায় শেখ আবদুল্লাহর সঙ্গে ভারত সরকারের একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। যা জুলাই চুক্তি হিসেবে পরিচিত। এই চুক্তির ফলে কাশ্মীরের জন্য স্বতন্ত্র পতাকা, মহারাজের স্থলে নির্বাচিত প্রধান এবং স্বতন্ত্র সংবিধান গ্রহণের অধিকার আবদুল্লাহকে দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এটি ছিল ভারতীয় সার্বভৌমত্বের উপর এক বড় আঘাত এবং আবদুল্লাহর নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জয়। এটিও বলতে হয়, কাশ্মীর প্রসঙ্গে নেহরুর সেদিনের ভূমিকা আর যাই হোক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কোনও দেশনায়কের ভূমিকা ছিল না।

সেদিন আবদুল্লাহর এই বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এক বঙ্গসন্তান। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সংসদে শ্যামাপ্রসাদ নেহরুকে প্রশ্ন করেন, "আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি শেখ আবদুল্লাহ কি ভারতের সংবিধান রচনার অন্যতম অংশীদার ছিলেন না? তিনিও সংবিধান সভার একজন সদস্য ছিলেন। তিনিও কি এই সংবিধানকে স্বীকার করে নেননি? যদি অন্যসব রাজ্যের ক্ষেত্রে এই সংবিধান যথাযথ হয়, তাহলে কাশ্মীরের ক্ষেত্রে এটি তিনি যথেষ্ট নয় বলে মনে করছেন কেন?" বলাই বাহুল্য, নেহরু এ-প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি। শ্যামাপ্রসাদ কিন্তু কাশ্মীরের

বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে রুখতে সক্রিয় আন্দোলনের পথেই অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালের মে মাসে শান্তি মিশনে শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীর যাত্রা করেন। কাশ্মীরেই আবদুল্লাহ সরকারের পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ২৩ জুন পুলিশি হেপাজতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় শ্যামাপ্রসাদের। শ্যামাপ্রসাদের বৃদ্ধা জননী যোগমায়াদেবী এই ঘটনার তদন্ত দাবি করেছিলেন। কিন্তু নেহরু বা আবদুল্লাহ কেউই এই দাবিকে মান্যতা দেননি।

একথা আজ অস্বীকার করলে চলবে না যে, নেহরুর অদূরদর্শিতা, হঠকারিতা এবং শেখ আবদুল্লাহর বিচ্ছিন্নতাকামী মনোভাব কাশ্মীরকে আজ পাকপন্থী জঙ্গিদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র হিসেবে পরিণত করতে সহায়ক হয়েছে। কাশ্মীরে কী ভয়ংকর বিষবৃক্ষটি শেখ আবদুল্লাহ রোপণ করতে চলেছেন—তা যদি নেহরু সেদিন অনুধাবন করতে পারতেন, তাহলে বোধকরি, আজ কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথা তুলতে পারত না। এও বিস্ময়ের যে, সেদিন শ্যামাপ্রসাদ যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা নেহরু দিতে পারলেন না কেন? বিজেপির সামনে আজ বড় কর্তব্য এই যে, ইতিহাসের এই পর্বটি মানুষের সামনে তুলে ধরে তাদের অবহিত করা—কার রাজনৈতিক স্বার্থে কাশ্মীরের জন্য এই ৩৭০ ধারা সংবিধানে সংযোজন করা হয়েছিল। এও অবহিত করা যে, এই ৩৭০ ধারাই ভারতীয় সার্বভৌমত্বের গোড়ায় কুঠারাঘাত করেছে, কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। বাম তকমাধারী ঐতিহাসিকদের ইতিহাসের একপেশে ব্যাখ্যার বদলে প্রকৃত সত্যটি দেশবাসীকে যদি জানাতে পারে বিজেপি—তবে সেটাই হবে বড় কাজ। আর জনমত গড়ে উঠবে এই প্রয়াসের মাধ্যমেই। সংবিধানে ৩৭০ ধারা সংযোজন করার সময় সংবিধান সভায় এও বলা হয়েছিল, অন্যান্য রাজ্যগুলির মতো কাশ্মীরও যখন ভারতের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে পুরোপুরি অনুকূল হয়ে পড়বে—তখনই ৩৭০ ধারার প্রযোজন আর থাকবে না। স্বাধীনতার ছ'দশক কিন্তু ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে। শেখ আবদুল্লাহর পুত্র ফারুক আবদুল্লাহ এবং পৌত্র ওমর আবদুল্লাহ কেন্দ্রীয় সরকারে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী থেকেছেন। এরপরেও ধরে নিতে হবে, ভারতের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে কাশ্মীরের অবস্থা এখনও অনুকূল হয়নি? যতদিন কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা জারি থাকবে, ততদিন কাশ্মীরের ওপর ভারতের অধিকার একটি প্রশ্নচিহ্ন হয়েই থাকবে—একথা ভারতের মানুষকে বোঝাতে হবে বিজেপিকেই। আর এই প্রশ্নচিহ্নটি যতদিন থাকবে—ততদিন উৎসাহ বোধ করবে পাকপন্থী বিচ্ছিন্নতাকামীরাই। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা যে ভারতের অখণ্ডতা, সংহতি এবং সার্বভৌমত্বের পক্ষে ক্ষতিকারক—মানুষকে সম্যকভাবে অবহিত এবং সচেতন করতে হবে এ-প্রসঙ্গে। সে সঙ্গে এ-ও মানুষকে বোঝাতে হবে, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অবশিষ্ট ভারতে যে-বিধি প্রচলিত, কাশ্মীরের জন্য তাই প্রয়োজ্য হবে। ৩৭০ ধারার হুজুগ তুলে তাকে বিচ্ছিন্নতাকামী পাকপন্থীদের হাতের পুতুল করে তোলা চলবে না।

কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন বাংলার অন্যতম কৃতী সন্তান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর কোনও তদন্ত হয়নি। শ্যামাপ্রসাদের প্রতি সেদিন অবহেলা প্রদর্শন করে কার্যত বাঙালিকেই অপমান করেছিলেন নেহরু এবং শেখ আবদুল্লাহ। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের জোরালো দাবি যদি বাংলার বুক থেকেই আজ ওঠে—তাহলে অন্তত শ্যামাপ্রসাদকে প্রকৃত সম্মান জানানোটি হয়।

—রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বর্তমান পত্রিকা, ২৪শে জুন ২০১৪

কোদালকে এখন কোদাল বলতেই হবে

সম্প্রতি এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া বাংলাদেশ সীমান্তে ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি প্রশিক্ষণ শিবির খুলেছে। এইসব শিবিরে ইসলামিক জঙ্গিদের নাশকতামূলক এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণ শেষে সীমান্ত পার করে এদের এই রাজ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকাশিত সংবাদেই জানা যাচ্ছে, এই জঙ্গি শিবিরের তথ্য হাতে আসামাত্রই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্তাব্যক্তিরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারেরও গোচরে এনেছে। শুধু বাংলাদেশ সরকারের গোচরে আনা নয়, রাজ্য সরকারকেও বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করেছে কেন্দ্র। এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিনের ভিতর আরও দুটি সংবাদও সকলের গোচরে এসেছে। তাহল—বাংলাদেশের আত্মগোপনকারী কুখ্যাত এক জঙ্গিকে এই রাজ্য থেকেই সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও একটি ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীর এক শীর্ষস্থানীয় নেতাও সম্প্রতি ধরা পড়েছে এই রাজ্যে। এই সংবাদগুলি পাঠ করলে অশনিসংকেতটি অতি সহজেই বোঝা যায়। এই সংবাদগুলি পাঠ করলে যে শুধু দেশের নিরাপত্তা এবং অখণ্ডতা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, তা শুধু নয়। আশঙ্কিত হওয়ার আরও একটি কারণ রয়েছে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী প্রশ্নে দীর্ঘদিন রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের তথাকথিত 'সেকুলার' বিদ্বজ্জনসমাজ নির্বিকল্পসমাধি অবলম্বন করার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎও কি অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে না? পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ নিয়েও কি আতঙ্কিত হয়ে পড়ার কারণ থাকছে না? পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া বাংলাদেশ সীমান্তে ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির সুলুক-সন্ধান পাওয়ার পর কেন কেন্দ্র অবিলম্বে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী দূর করতে পদক্ষেপ করবে না—সে প্রশ্নও এখন ওঠা বাঞ্ছনীয়। এই প্রশ্নও ওঠা বাঞ্ছনীয় যে, অনুপ্রবেশকারী দূর করার প্রশ্নে যে তথাকথিত 'সেকুলার'রা বিরোধিতা করছেন—তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠীর কোন ভবিষ্যৎ কামনা করেন?

একথা মনে করার কোনওই কারণ নেই যে, এই ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি সীমান্তে সংকীর্তন করার জন্য আখড়া খুলে বসেছে। বা, এরা ভারতের প্রতি সম্প্রীতি বার্তা বয়ে নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে ঢুকে পড়েছে। বরং, এই মৌলবাদী ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির মনোভাব কতটা আগ্রাসী, কীভাবে এরা সারা বিশ্বেই এখন নিজেদের

সাম্রাজ্যের জাল বিস্তার করতে চাইছে—তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন ইরানের বিশিষ্ট লেখক-বুদ্ধিজীবী আলি সিনা।

ইসলামিক মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির কাজকর্মের বিরুদ্ধে চিরকালের প্রতিবাদী আলি সিনা লিখেছেন—এই গোষ্ঠীগুলি অমুসলিম দেশগুলিতে অধিক সংখ্যায় অনুপ্রবেশ করে সেখানে নিজেদের জনগোষ্ঠী বাড়িয়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত সেই দেশে একটি নির্ণায়ক শক্তিতে যখন তারা পৌঁছায়, তখনই অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর হামলা চালিয়ে, তাদের জোর করে ধর্মান্তরিত করে, নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে চায়। আলি সিনা লিখছেন—'Terrorists are simply doing that and we the intellectual apologists of Islam are justifying it.' আলি সিনার এই সতর্কবার্তাটি যদি পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে আজ বিচার করার চেষ্টা আমরা করি— তাহলে দেখব, এখানেও ইসলামিক মৌলবাদীদের সেই নীরব আগ্রাসনই ঘটে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় জনসংখ্যা যদি শতকরা হিসাবে বিচার করা হয়, তাহলেই দেখা যাবে—এখানে কীভাবে সেই গোষ্ঠীবিন্যাসটি ক্রমশ বদলে গিয়েছে। ১৯৫১ সালে এই রাজ্যে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৭৮.৪৫ শতাংশ। মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১৯.৮৫ শতাংশ। ২০০১-এ তা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭২.৪৭ এবং ২৫.২৫ শতাংশ। ২০১১-য় হিন্দু জনসংখ্যা ৬৯.২৮। যদি এই হারেই এই রাজ্যে হিন্দু জনসংখ্যা কমতে থাকে, তাহলে ২০৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক হিন্দু জনসংখ্যা হবে ৪৯.৭৪ শতাংশ। [তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ একটি বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ—মোহিত রায়] এবং অবশ্যই গরিষ্ঠতা অর্জন করবে মুসলিম জনগোষ্ঠী। আলি সিনা সারা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে যে সতর্কবার্তাটি উচ্চারণ করেন, তা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও কীভাবে মিলে যায়—তা এই পাটিগণিতের হিসাবেই প্রমাণিত। এরপরেও পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কিত না হয়ে থাকা যায়?

অনেকেই বলতে পারেন, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ এবং সীমান্তে জঙ্গি শিবিরের অস্তিত্বের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংকটকে এভাবে মিলিয়ে দেখাটি ঠিক নয়। তাঁরা বলতেই পারেন—পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনগোষ্ঠী ভবিষ্যতে বিপন্ন হয়ে পড়বে—এমন কল্পনাটি অলীক। বলতেই হচ্ছে, এরকম ধারণা নিয়ে বাস করলে তা মূর্খের স্বর্গে বাস করাই হবে। বরং, ঘটনা প্রবাহ, তথ্যাদি ইত্যাদি বিচার করলে দেখা যাবে—এইগুলির সঙ্গে ভবিষ্যতে এই রাজ্যেও হিন্দু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে ওঠার যোগসূত্র রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কতগুলি তথ্য তুলে ধরলে আরও বুঝতে সুবিধা হবে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু (ইচ্ছা করেই সংখ্যালঘু শব্দটি ব্যবহার করলাম না) মুসলিম জনগোষ্ঠী কত দ্রুত শক্তিমান হয়ে উঠছে এবং ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হতে চাইছে। ২০১০-এ রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষা আজ দেশের

গর্ব' শীর্ষক পুস্তিকায় দেওয়া তথ্য অনুসারে জানা যাচ্ছে, ১৯৭৭ সালে এই রাজ্যে মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪,৩৮৮। ২০১০-এ তা বেড়ে হয়েছে ৪,৫০,০০০। ১৯৭৭-এ মাদ্রাসা শিক্ষায় খরচ হত ৫ লক্ষ ৫০ হাজার। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৬১০ কোটি! এই মাদ্রাসা শিক্ষারই সম্প্রসারণ ঘটেছে কলকাতায় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে। এখানেও মাদ্রাসার মতো আরবি ও ইসলামি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এই আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ছাত্রীদের নয়, শিক্ষিকাদেরও বোরখা পরার ফতোয়া জারি করেছিল মাদ্রাসা ছাত্র সংগঠন। জনৈকা মুসলিম শিক্ষিকা তা মানতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে ক্লাস নিতে দেওয়া হয়নি। যে মুক্তচিন্তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সর্বদা অগ্রণী থেকেছে, সেখানে এই ঘটনা কি চিন্তার নয়? ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেগঙ্গায় তিনদিন ধরে দফায় দফায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর হামলা হয়। সংবাদপত্রের প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ীই ৫০টি বাড়ি ও দোকান সেই হামলায় ধ্বংস হয়েছিল। ৩০০টি দোকান লুটপাঠ হয়েছিল। নেমেছিল সেনাবাহিনী। ওই বছরই দেগঙ্গা অঞ্চলের ১৮টি দুর্গাপুজো কমিটি পূজাই করেনি। এই জঘন্য ঘটনার নিন্দায় এই রাজ্যের 'সেকুলার' বিদ্বজনরা একটিও শব্দ ব্যয় করেননি। অহরহ নরেন্দ্র মোদিকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে গাল পাড়ছেন যে কলমচিরা, তাঁরাও এই ঘটনার প্রতিবাদে কলমের কালি খরচ করেননি। উগ্র ইসলামি মৌলবাদ যে কতখানি থাবা বসিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে, তার প্রমাণ হিসাবে আর একটি সংবাদেরও উল্লেখ করা যায়। ২০০৮-এর জুলাই মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজি কাগজের সংবাদে জানা যায় যে, মুর্শিদাবাদে একটি শরিয়তি বিচারসভা জনৈক হিন্দু যুবককে মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং তা কার্যকরও করে। ওই যুবকটির অপরাধ সে একটি স্থানীয় মুসলিম মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। এইসব ঘটনা আশঙ্কার এই কারণেই যে, প্রতিটি ঘটনাতেই অপরাধীরা আইনের ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে থেকে গিয়েছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলির প্রশ্রয় এবং আশ্রয় পেয়েছে। তোষণের রাজনীতির বিষময় পরিণামটিও যে কী—তাও এইসব ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। দৈনন্দিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিভিন্ন অপরাধের সংবাদগুলির দিকে চোখ বোলালেই দেখা যাবে—অধিকাংশ অপরাধের ঘটনাতেই যাদের নাম উঠে আসছে, তারা 'দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু' সম্প্রদায়েরই মানুষ। সম্প্রতি হাওড়ায় এক হোটেল মালিকের মৃত্যুর ঘটনায় ধৃত রিয়াজ সম্পর্কে জানা যাচ্ছে, হাওড়ার ওই অঞ্চলে বিজেপির বৃদ্ধি আটকাতে এই সমাজবিরোধীটিকে কাছে টেনে নিয়েছিল শাসকদল।

এ প্রসঙ্গে এটিও মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এখন আর নিতান্ত হীনবল সংখ্যালঘু মনে করা ভুল হবে। বরং তারা পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় দাপটে এখন যথেষ্টই বলীয়ান। যে কারণেই এই লেখায় তাদের 'দ্বিতীয়

সংখ্যাগুরু' হিসেবে উল্লেখ করেছি। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে তারা এখন নির্ণায়ক সংখ্যা। তারাই এখন ঠিক করে দেয় পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতা কার হাতে থাকবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্বিন্যাস হওয়ার ফলে হিন্দু-অধ্যুষিত পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূমে আসনসংখ্যা কমলেও মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর এবং নদীয়ায় বিধানসভা আসন বেড়েছে। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক দাপট এদের এতখানিই যে, তসলিমা নাসরিনকে এরা কলকাতা ছাড়তে বাধ্য করেছে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ছাত্রীদের উপর ফতোয়া জারি করেছে। আর এখন তো প্রাক্তন কমিউনিস্ট, বর্তমানে হাজি, রেজ্জাক মোল্লা ধুয়ো তুলেছেন—ভবিষ্যৎ পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী চাই। ঠিক সেই সোরাবর্দির আমলে মুসলিম লিগের কথারই প্রতিধ্বনি। অথচ, ইতিহাস বলে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি গঠনের মূল শর্তই ছিল এটি হবে বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর নিজস্বভূমি। বাঙালি হিন্দুর গরিষ্ঠতাই এখানে স্বীকৃত হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'জ্ঞানযোগ'-এ লিখেছিলেন—'মুসলমানরা মুখে বলে চলেছে সার্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের কথা, কিন্তু বাস্তবে কী দেখা যাচ্ছে? কোনো অমুসলমান ব্যক্তির পক্ষে এই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব তো নয় বটেই, বরং তার গলা কাটার সম্ভাবনাই দেখা দেবে।' স্বামীজি তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে ভবিষ্যতের ইসলামিক মৌলবাদের বিপদটি আঁচ করেছিলেন। আমরা, সেই বিপদটি আঁচ করছি না, বরং নীরবতাকে হিরণ্ময় মনে করে, পশ্চিমবঙ্গের মুক্ত উদার সমাজজীবনটির ভবিষ্যৎ সংকটময় করে তুলছি। মনে রাখতে হবে, ভারতকে যদি বিপন্ন করে তুলতে চায় ইসলমামিক জঙ্গিরা, তাহলে প্রথমেই তাদের আঘাত করতে হবে হিন্দুধর্ম এবং দর্শনের উপর। তথাকথিত সেকুলারপন্থীরা স্বীকার করুন বা না করুন, **হিন্দুদর্শনের মূলসূত্রই ভারতকে এত হাজার বছর ধরে একসূত্রে গ্রন্থিত করে রেখেছে**। ইসলাম বা খ্রিস্টধর্ম তা করেনি। কারণ হিন্দুদর্শনের সৃষ্টি; তার বিকাশ ভারতের মাটি থেকে। ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মের সৃষ্টি বা বিকাশ ভারতের মাটিতে নয়। ফলে, হিন্দুদর্শন ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গে যতখানি একাত্ম—ইসলাম বা খ্রিস্টধর্ম ততখানি নয়। কাজেই ভারতকে যদি বিপন্ন করে তুলতেই হয়, তাহলে আঘাতটা হানতে হবে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের উপর—সেটা জানে উগ্র, মৌলবাদী ইসলামিক জঙ্গিরা। এই আঘাতের বাইরে পশ্চিমবঙ্গও নেই।

আমাদের ভাবতে হবে, কোন পশ্চিমবঙ্গকে আমরা এখন চাই। মহম্মদ আলি জিন্নাহর পাকিস্তান থেকে ছিনিয়ে আনা হিন্দু জনগোষ্ঠীর নিজভূমি হিসাবে গড়ে তোলা পশ্চিমবঙ্গকে, নাকি অনুপ্রবেশকারীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র, মুক্তচিন্তা-হরণকারী মৌলবাদীদের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক দাপটের ময়দান হিসাবে পশ্চিমবঙ্গকে? আর

পশ্চিমবঙ্গ যতই বিপন্ন হবে, ততই বিপন্ন হয়ে পড়বে তার সংখ্যাগুরু হিন্দু জনগোষ্ঠী। যদি এখনও যথেষ্ট সতর্কতা না আসে আমাদের, তাহলে কে জানে, ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ নয়, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনগোষ্ঠীকে হয়তো ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে বিহার, উত্তরপ্রদেশ বা ওড়িশায় আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে হবে। সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের আগেই পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যদি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় সচেতন হতে পারে—তবেই মঙ্গল। তথাকথিত সেকুলার সাজার ভড়ং নয়, কোদালকে এখন কোদাল বলতেই হবে।

—রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বর্তমান পত্রিকা, ১৫ই জুলাই ২০১৪

দেশের ভিতরে আল কায়েদার ক্ষেত্র যারা প্রস্তুত করে দিচ্ছে, তাদের চিনতে হবে

ভারতকে এবার তার লক্ষ্যবস্তু করেছে আল কায়েদা। আল কায়েদা প্রধান জাওয়াহিরি ঘোষণা করেছেন, ভারত তাদের নিশানার ভিতর রয়েছে এবং যে-কোনও মুহূর্তেই ভারতে আঘাত হানবে আল কায়েদা। আল কায়েদার এই হুমকিকে গুরুত্ব না দিয়ে নিতান্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে অত্যন্ত অন্যায় হবে। মনে রাখতে হবে, আল কায়েদা এবং তার সহযোগী জঙ্গি মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আঘাত হেনেছে, আঘাত হানছেও। তাদের এই আঘাত থেকে ভারত যে বাদ গিয়েছে এমন নয়। সংসদ ভবন এবং মুম্বই হামলার স্মৃতি ভারতের রয়েছে। এখন, ভারতকে নিশানা করে আরও মারাত্মক কোনও আঘাত হানার পরিকল্পনা যদি করে থাকে আল কায়েদা—তাহলে তা হবে আশঙ্কারই বিষয়। কাজেই জাওয়াহিরির এই হুমকিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভারতকে এই মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতেই হবে। সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার আল কায়েদার এই হুমকির পরই সতর্ক হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করতে তৎপর হয়েছে কেন্দ্র। মনে রাখতে হবে, ভারত শুধু নয়, সারা বিশ্বের সামনেই এখন আল কায়েদা এবং তার সহযোগী ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি বড় বিপদ। এই বিপদ যে কতখানি গুরুতর, তা সম্যক উপলব্ধি করছে এখন সমগ্র বিশ্বই। ভারতের ক্ষেত্রে এই বিপদটি আবার দ্বিবিধ। ভারতের ক্ষেত্রে এই বিপদটি বাইরের এবং ভিতরেরও। আল কায়েদা এবং অন্যান্য ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির হামলার বিপদ যেমন ভারতের সামনে রয়েছে, তেমনই দেশের অভ্যন্তরে তথাকথিত সেকুলারের ভান ধরে থাকা মৌলবাদের বন্ধুরাও ভারতের সামনে আর একটি বড় বিপদ। এরা দেশের অভ্যন্তরে মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির কাজকর্মের ক্ষেত্র যে প্রস্তুত করে দিচ্ছে—সেটিও মনে রাখতে হবে। কাজেই শুধু আল কায়েদার হামলা প্রতিহত করতে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলেই যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে তা নয়। জঙ্গি মৌলবাদকে যদি প্রতিহত করতেই হয়, তাহলে দেশের ভিতরে যারা তাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিচ্ছে তাদেরও চিহ্নিত করে বিনষ্ট করার প্রয়োজন আছে বইকি।

তথাকথিত সেকুলারপন্থীদের কাঁধে ভর করে দেশের অভ্যন্তরে মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির জাল বিস্তারের কৌশলটি ইরানের বিশিষ্ট রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এবং

ভাষ্যকার আলি সিনা উপলব্ধি করেছেন। আলি সিনা তাঁর নিবন্ধ 'A call to Muslims of the world from Faith Freedom International' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন— '...In its so called pure form it can very well be interpreted as a doctrine of hate. Terrorists are simply doing that and we the intellectual apologists of Islam are justifying it.' কেন একথা বলছেন আলি সিনা? ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির কাজকর্ম বিশ্লেষণ করে আলি সিনা দেখেছেন, তথাকথিত সেকুলারপন্থীরা প্রগতিশীল সাজার ভেক ধরে কার্যত মৌলবাদী কার্যকলাপকে নীরবে মেনে নিচ্ছেন এবং তার ফলেই এই ইসলামিক মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি দেশের ভিতর তাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং বিস্তার করতে সহায়তা পাচ্ছে। প্রভাব বিস্তার করতে পারছে দেশের অভ্যন্তরেও। যদি ভারতের পটভূমিকায় বিচার করি, তাহলে দেখব, আলি সিনা খুব ভুল কিছু বলছেন না। বরং, সেকুলারপন্থীদের রহস্যজনক মৌনতার কারণে, ভারতের অভ্যন্তরেও মৌলবাদীরা সক্রিয় হয়ে উঠছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের কার্যকলাপ। কীরকম বৃদ্ধি পাচ্ছে কার্যকলাপ? শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের দিকেই একবার চোখ ফিরিয়ে দু-একটি ঘটনা দেখে নেওয়া যাক। ২০০৮ সালের জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদে একটি শরিয়তি আদালত এক হিন্দু যুবককে মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং তার মাথা কেটে তা কার্যকর করে। ওই হিন্দু যুবকটির অপরাধ, সে একটি মুসলিম মেয়েকে ভালোবেসে বিবাহ করেছিল। মনে রাখতে হবে, ঘটনাটি মধ্যপ্রাচ্যের কোনও ইসলামিক রাষ্ট্রের নয়। খোদ পশ্চিমবঙ্গের ঘটনা। সেই পশ্চিমবঙ্গ, যা বরাবর মুক্তচিন্তার পীঠস্থান হিসাবে চিরকাল খ্যাত। ২০০৯ সালের ৮ জানুয়ারি মেদিনীপুর শহরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মিছিল থেকে একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এরপরে ওখানে সরস্বতী পূজা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে প্রশাসন। কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বোরখা পরতে না-চাওয়ার 'অপরাধে' এক মুসলিম শিক্ষিকাকে হেনস্থা হতে হয়েছে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতে। প্রশ্ন উঠবেই, মুক্তচিন্তার পরিবর্তে কোন চিন্তায় লালিত হচ্ছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্ররা? কট্টর মৌলবাদী ভাবনাতেই কি লালিত হচ্ছে না তারা? দেগঙ্গার ঘটনাটিও কিন্তু বিস্মৃত হওয়ার নয়। দেগঙ্গা কলকাতা থেকে মাত্র ৪৫ কিলোমিটার দূরে, বারাসত থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার। ২০১০ সালের ৬, ৭, এবং ৮ সেপ্টেম্বর তিনদিন ধরে দেগঙ্গায় দফায় দফায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর হামলা চলে। পঞ্চাশটি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনশোটি দোকান লুটপাট হয়। ফলশ্রুতিতে সে-বছর দেগঙ্গায় ১৮টি সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি তাদের পূজা স্থগিত করে দেয়। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশে নয়, কলকাতা থেকে মাত্র ৪৫ কিলোমিটার দূরে একটি মফস্‌সল শহরে হিন্দু জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হচ্ছে ইসলামিক মৌলবাদীদের হাতে। ঠিক একইরকম ঘটনা ঘটেছে ২০১২ সালে ক্যানিংয়ে। আরও পিছিয়ে যান। মৌলবাদীদের চাপে কলকাতা থেকে তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়নের মতো ঘটনাও ঘটেছে।

এইসব ঘটনায় তথাকথিত সেকুলারপন্থীদের প্রতিক্রিয়া কী? সেকুলারপন্থীরা বরাবর এসব ঘটনায় নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। একটি সত্য এই সেকুলারপন্থীরা আসলে বুঝতে ভুল করছেন। এরা মনে করছেন, ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার অর্থই বুঝি সমগ্র মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে যাওয়া। বিষয়টি যে আদৌ তা নয়, তা বোঝার প্রযোজনীয়তাই বোধ করেন না সেকুলারপন্থীরা। বুঝতে চান না যে, লড়াইটা আসলে ইসলামিক মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে। আর এঁদের এই নীরবতাই ইসলামিক মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহিত করছে। তাদের অবাধ ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাওয়ার পথটি সুগম করছে। তার প্রমাণ খোদ কলকাতা শহরের বুকে মৌলবাদী সংগঠনগুলির ক্রমবর্ধমান প্রকাশ্য সমাবেশ।

এই সেকুলারপন্থীদের ভান সর্বস্ব রাজনীতি কীভাবে আড়াল করে মৌলবাদী জঙ্গিদের? গত দেড়-দশকে দেশে বহুল আলোচিত গুজরাত-দাঙ্গা। এই গুজরাত-দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুলে সেকুলারপন্থীরা সর্বত্র, সর্বসময় আক্রমণ করেন নরেন্দ্র মোদিকে। এমনকী মোদিকে হিটলারের আসনেও তাঁরা বসিয়ে ছেড়েছেন। সেই গুজরাত-দাঙ্গা প্রসঙ্গটির উত্থাপন করা যাক। গুজরাত-দাঙ্গার সূত্রপাত গোধরায় করসেবক বোঝাই একটি ট্রেনের কামরায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনার পর। ওই ঘটনার পর প্রাক্তন বামপন্থী সংসদ সদস্য এ কে রায় বলেছিলেন, কামরায় অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর যাত্রীরা ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে প্রাণ বাঁচাতে পারেননি। কেননা, ট্রেনের কামরার বাইরে আরও বিপদ অপেক্ষা করেছিল। কী বিপদ অপেক্ষা করছিল? 'দ্য স্টেটসম্যান' কাগজে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, প্রায় এক হাজার সশস্ত্র মানুষ ট্রেনটিকে ঘিরে রেখেছিল। পুলিশ বা দমকল কাউকেই ওই ট্রেনটির কাছে তারা পৌঁছতে দিচ্ছিল না। সেকুলারপন্থীরা একবারও ঘুণাক্ষরেও গোধরার এই ভয়াবহ-মর্মান্তিক ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেন না। সম্প্রতি কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর নেতা দিল্লিতে এসে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করে গেলেন। সে বিষয়ে সেকুলারপন্থীদের মুখে কুলুপ কেন? কেন সেকুলারপন্থীরা একবারও বলবেন না, ইসলামিক মৌলবাদীদের কোনও অধিকারই নেই ভারতের মাটিতে উগ্র মৌলবাদ কায়েম করার। কেন সেকুলারপন্থীদের মুখে একবারের জন্যও ইমাম ভাতার মতো সংকীর্ণ ধর্মীয় তোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হবে না? গাজায় প্যালেস্তানি হামলার যদি প্রতিবাদ করতে পারেন, তাহলে কেন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর অত্যাচারের ঘটনায় এঁরা প্রতিবাদ জানাবেন না? আর এখন তো ক্রমশ প্রকাশ হচ্ছে, নরেন্দ্র মোদিকে দাঙ্গাবাজ বলেছিল এরাজ্যের ক্ষমতাসীন যে রাজনৈতিক দলটি, সেই দলেরই এক সংসদ সদস্যের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি মৌলবাদী সংগঠনের কাছে পৌঁছেছে সারদা গোষ্ঠীর কাঁচা টাকা। এই সংসদ সদস্যটি নিষিদ্ধ জঙ্গি ইসলামিক সংগঠন

সিমি-র রাজ্য সভাপতি ছিলেন। ভানসর্বস্ব সেকুলারপন্থীদের এই নীরবতাই কি মৌলবাদকে আরও প্রশ্রয় জোগায় না? মৌলবাদ পায়ের নীচে ক্রমশ আরও শক্ত জমি পেয়ে যায় নাকি এর ফলেই? আর এ বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, মৌলবাদ যদি এ-দেশে পায়ের নীচে শক্ত জমি পেয়ে যায়, তাহলে ভারতকে লক্ষ্যবস্তু করে আঘাত হানতে আল কায়েদার খুব একটা সমস্যা হবে না।

এই ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনগুলি কীভাবে জাল বিস্তার করে, আলি সিনা তারও বিবরণ দিয়েছেন। বলেছেন, 'অ-ইসলামিক রাষ্ট্রগুলিতে এই ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনগুলি অনুপ্রবেশের মাধ্যমে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। অ-ইসলামিক রাষ্ট্রগুলিতে অনুপ্রবেশ করে এই অনুপ্রবেশকারীরা ক্রমে সেখানে বসবাস এবং পেশাগত কাজকর্ম করতে শুরু করে। ক্রমে জনসংখ্যার একটি প্রভাবশালী অংশ যখন এরা হয়ে ওঠে, তখনই এদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পেতে থাকে। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিকভাবে অ-ইসলামিক রাষ্ট্রগুলিতে তারা তখন প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী হয়।' এক্ষেত্রেও ভারতের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখবেন, আলি সিনা কিছু ভুল বলেননি। ১৯৯০ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত লোকসভায় জানিয়েছিলেন যে, ভারতে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ১ কোটি। এই ১ কোটি অনুপ্রবেশকারীর গরিষ্ঠাংশই বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিম অনুপ্রবেশকারী। ২০০৪ সালের ১৪ জুলাই তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়াল লোকসভায় জানিয়েছিলেন, ভারতে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৪০ জন বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। সংখ্যাটি হেলাফেরা করার মতো নয়। কিন্তু এই বিপুল অনুপ্রবেশের চাপে কী হয়েছে? আবার পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকানো যাক। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলিতে সামাজিক ভারসাম্যটাই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। দেগঙ্গার ঘটনার মতো নানাবিধ ঘটনা হামেশাই ঘটছে। তার কিছু প্রকাশ্যে আসছে। অধিকাংশ প্রশাসনের চাপে আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। তার চেয়েও বড় কথা, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনগোষ্ঠী এখন ৩২ শতাংশে পৌঁছেছে। কার্যত এই জনগোষ্ঠীই এখন নির্বাচনের সময় রাজনৈতিকভাবে ঠিক করে দিচ্ছে সরকারে কে থাকবে আর কে থাকবে না। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী চাই জাতীয় আওয়াজও উঠেছে ইতিমধ্যেই। একটু ভাবলেই বুঝবেন, এগুলি খুব শুভ সংকেত নয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে মুসলিম লিগের আমলে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেদিকেই বোধকরি আবার ফিরতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। আর তা যদি ফেরে তাহলে লাভ কার? উত্তরটা খুব সোজা—আল কায়েদা এবং তার সহযোগী ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির।

কাজেই ভারতকে যদি আল কায়েদার মতো শক্তিকে প্রতিহত করতেই হয়, তাহলে লড়াইটা শুধু বাইরে করলে চলবে না। ঘরের ভিতরেও একটি কঠিন লড়াই

করতে হবে দেশকে। আল কায়েদাকে প্রতিহত করতে হলে ঘরের ভিতরের এই লড়াইটি জেতা অত্যাবশ্যক। যাদের ইচ্ছাকৃত নীরবতা এবং পরোক্ষ প্রশ্রয় আজ দেশের ভিতর মৌলবাদী শক্তিদের বৃদ্ধিতে উৎসাহ জোগাচ্ছে, আল কায়েদার মতো জঙ্গি গোষ্ঠীর ভারতে প্রবেশের পথ সুগম করে দিচ্ছে—তাদের চিহ্নিত করতে হবে। দেশ এবং দশের স্বার্থেই তাদের চিহ্নিত করতে হবে। বিচ্ছিন্ন করতে হবে তাদের জনজীবন থেকে। ভারতের সংহতি এবং অখণ্ডতার স্বার্থেই মৌলবাদের বিরুদ্ধে ঘরে এবং বাইরে—উভয়তই সংগ্রামটি গুরুত্ব সহকারেই করতে হবে। আলি সিনা লিখেছেন—
"The hatred has filled the air and the world is bracing itself for its doomsday. Should we not ask ourselves whether we have contributed, unwittingly, to this tragedy and whether we can stop the great disaster from happening.'

উত্তর আলি সিনার এই বাক্যটির ভিতরই লুকিয়ে রয়েছে।

—রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বর্তমান পত্রিকা, ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৪

অনুপ্রবেশ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন একটি জন আন্দোলন

মোহিত রায়

প্রায় চার দশক ধরে ধামাচাপা অনুপ্রবেশ সমস্যা এখন সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। কয়েক মাস আগেও যাঁরা অনুপ্রবেশ বলে বাংলায় কোনও শব্দ আছে কিনা তাই প্রশ্ন তুলতেন তাঁরাও এখন ঢোক গিলে মানছেন যে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ ঘটছে। এর একমাত্র কৃতিত্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির, যিনি তাঁর নির্বাচনী ভাষণে এই ভয়াবহ অনুপ্রবেশের বিষয়টি পরিষ্কার করে জনসাধারণকে জানিয়েছিলেন। তিনি আরও পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছিলেন যে, অনুপ্রবেশকারী কারা। বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলমানরা অনুপ্রবেশকারী ও অ-মুসলমানরা উদ্বাস্তু—এই সরল সত্যটাও তিনি জনতার কাছে প্রকাশ করেন। প্রত্যেক পশ্চিমবঙ্গবাসীর এ জন্য নরেন্দ্র মোদীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে ১৯৯০ সালে সংসদে ভারতের কমিউনিস্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত জানিয়েছিলেন, ভারতে ১ কোটি বাংলাদেশির কথা। ১৯৯২ সালে গণশক্তি পত্রিকায় স্বনামে প্রবন্ধ লিখে মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জানিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি মুসলমানদের ব্যাপক অনুপ্রবেশের কথা। এত সব সত্ত্বেও অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের ডিগ্রিশোভিত বাঙালি ঐতিহাসিক সমাজবিদরা মায় নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ এসব নিয়ে নীরব থেকেছেন ও কোনও আলোচনার সূচনাই করতে দেননি। এখন যখন সত্য প্রকাশিত তখন আমাদের করণীয় কী আমাদেরই ঠিক করতে হবে।

অনুপ্রবেশ সমস্যাটি বিপুল। পশ্চিমবঙ্গে এখনই ১ কোটি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে, আগামী দিনে আরও আসবে। এই অনুপ্রবেশকারীরা এমনি এমনি চলে আসেনি। এদের ভারতে আসার ও থাকার জন্য এদেশেই একটি বড় সাহায্যকারী শক্তি রয়েছে। এরা কংগ্রেস, তৃণমূল, কমিউনিস্ট—সব দলের সমর্থনেই এই দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালায়। এই অনুপ্রবেশকারীরা অনেকেই এদেশে কুড়ি-ত্রিশ বছর থেকে এখানে শিকড় গভীরে প্রবেশ করিয়েছে। এর জন্য স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের অন্তত দুটি হিন্দুপ্রধান জেলা মুসলমান প্রধান হয়ে গিয়েছে। অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জনমানচিত্র এত ভয়াবহভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির উদ্দেশ্যটিই প্রায়

বিনষ্ট হতে বসেছে। বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর কয়েক কিলোমিটার এখন অনুপ্রবেশকারীদের দখলে। প্রতি বছর হাজার হাজার গোরু পাচার এই অনুপ্রবেশকারীদের সহায়তা করার জন্য কোটি কোটি টাকা জোগাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা যে এই অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করার জন্য কংগ্রেস, তৃণমূল, কমিউনিস্ট, নকশালপন্থী, দলিত-মুসলিম জোট সবাই এককাট্টা। পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ বাম ও সেকুলার আকাদেমিক মহল ও এদের প্রভাবে মিডিয়ার এক বড় অংশ অনুপ্রবেশ সমস্যাকে চেপে রাখবার এবং এখন বিভ্রান্ত করাবার জন্য সচেষ্ট।

এত বড় জটিল সমস্যার সমাধান সরকারি দপ্তর বা শুধু আইন-কানুনের কাজ নয়। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অনুপ্রবেশকারীদের বিপদ সম্পর্কে অবহিত করা। এই অনুপ্রবেশকারীদের না বিতাড়িত করতে পারলে এবং অনুপ্রবেশ না বন্ধ করতে পারলে যে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বই আর থাকবে না, এটি বাংলাদেশে পরিণত হবে— এই সত্যটি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পৌঁছনোর জন্য প্রয়োজন একটি জন আন্দোলন। বাংলাদেশ থেকে ইসলামি অত্যাচারের কারণে আগত হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানরা যে উদ্বাস্তু, অনুপ্রবেশকারী নন—এই সত্যটিও প্রচারের প্রয়োজন, না হলে ইতিমধ্যেই বিশেষত, তৃণমূল কংগ্রেস উদ্বাস্তুদের অনুপ্রবেশকারী বলে মিথ্যা ভয় দেখাতে শুরু করেছে। এছাড়া সরকার অনুপ্রবেশ সমস্যা সমাধানে যে সব পদক্ষেপ নেবে তার সমর্থনেও জন আন্দোলন প্রয়োজন। নইলে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন সম্ভব হবে না। মনে রাখতে হবে অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে যথেষ্ট সহিংস ঘটনা ঘটিয়ে, আইন-শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির হুজুক তুলে সরকারি সমস্ত প্রচেষ্টাকে বন্ধ করে দেবার ঘটনা ঘটবেই। বর্তমান রাজ্য সরকার এইসব ঘটনাকে সমর্থন করবেন। আমরা দেখেছি, লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিতাড়নের দাবিতে ইসলামি মৌলবাদীরা বিনা বাধায় সারাদিন ধরে কলকাতায় যে লুটপাট-ভাঙচুর-অগ্নি সংযোগ চালায় তাকে তৎকালীন বামপন্থী সরকার থামানোর কোনও চেষ্টাই করেনি। এই অরাজকতাকে কংগ্রেস, তৃণমূল সমর্থন করেছিল এবং পরে তৃণমূল সরকার এই দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে সব মামলা তুলে নেয়। একমাত্র শক্তিশালী জন আন্দোলন এই দেশ বিরোধী সহিংস শক্তিকে মোকাবিলা করতে পারে।

অনুপ্রবেশ সীমান্তে বন্ধ করা অনেকটাই প্রশাসনিক ব্যাপার, কিন্তু গুছিয়ে বসা অনুপ্রবেশকারীদের হঠানো শুধু আইনি হুকুমে হবে না। এই অনুপ্রবেশকীরদের শক্তির উৎস ও রুজি-রোজগারের পথগুলি বন্ধ করতে পারলে অনুপ্রবেশকারীরা এখানে থেকে যাবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। এর জন্য সরকার কী করতে পারে? প্রথমেই কেন্দ্রীয় সরকারকে জাতীয় স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গে একটি বিশেষ জনগণনা শুরু করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে নাগরিকত্ব পরিচয়পত্র চালু করতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গে তা

খুব সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে। সমস্ত সন্দেহভাজনকে প্রাথমিকভাবে নাগরিকত্ব দেওয়া যাবে না এবং তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে সাময়িকভাবে বাদ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এখন আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনেকেই বিদেশিদের ভোটে নির্বাচিত, এমনকী অনেক অনুপ্রবেশকারীরাও পঞ্চায়েত নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করে এইসব সন্দেহভাজনকে ভোটার তালিকা থেকে আপাতত বাদ দিতে হবে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে।

তৃতীয়ত, এইসব সন্দেহভাজনকে কোনও সরকারি ভরতুকি যেমন ১০০ দিনের কাজ, রেশন কার্ড, বিপিএল কার্ড, স্বাস্থ্য বীমা ইত্যাদি সুবিধা থেকে বাদ দিতে হবে। এক্ষেত্রে সন্দেহভাজনদের দুটি তালিকা করা যেতে পারে—কম সন্দেহভাজনদের কিছু সরকারি সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

চতুর্থত, কোনও সন্দেহভাজনকে সরকারি কাজে নিয়োগ করা যাবে না। যেসব সন্দেহভাজন এখন সরকারি দপ্তরে কর্মরত, তাদের ক্ষেত্রে আইনি পরামর্শ নিয়ে নিয়োগ বাতিল করার কাজ শুরু করতে হবে।

পঞ্চমত, সমস্ত নাগরিককে কাউকে কাজে নিয়োগ করার সময় তাঁর নাগরিক পরিচয়পত্র দেখে নিতে হবে। অনুপ্রবেশকারী সন্দেহভাজনকে নিয়োগ করলে তা পুলিশকে জানাতে হবে। অনুপ্রবেশকারী প্রমাণিত কাউকে কোনও কাজে নিয়োগ করলে নিয়োগকারীরও শাস্তি হবে।

ষষ্ঠত, পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর ৩০ কিলোমিটার প্রস্থ অঞ্চলের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা আইন চালু করে নিরাপত্তা বাহিনীকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে সীমান্ত অঞ্চলে মৌলবাদী কাজকর্ম, যেমন—যথেচ্ছ ধর্মস্থান নির্মাণ, গোরু পাচার ও অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। বিশেষত, বিএসএফের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।

সপ্তমত, অনুপ্রবেশকারী প্রমাণ হবার পর সেই ব্যক্তিদের বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের সব দলের সরকারই অনুপ্রবেশ স্বীকার করতে চায় না। এ জন্য প্রয়োজনে তাদের উপর অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করতে হবে।

এইসব কঠোর নজরাদরি শুরু হলে ও তার সমর্থনে তীব্র জন আন্দোলন জারি রাখলে অনুপ্রবেশকারীদের একটা বড় অংশ নিজেরাই পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে শুরু করবে, নতুনরা আর আসতে উৎসাহ পাবে না।

অবশ্যই এসব করা সোজা নয়। পশ্চিমবঙ্গে ২০০৭-এ কলকাতায়, ২০১০-এ দেগঙ্গায় ও ২০১২-তে ক্যানিংয়ে আমরা একতরফা মুসলমান দুষ্কৃতীদের হিন্দুর ঘরবাড়ি,

দোকান সম্পত্তি ধ্বংস করতে দেখেছি। দেখেছি রাজ্য সরকার কীভাবে নীরব থেকেছে, নীরব থেকেছে সব বড় রাজনৈতিক দল, মিডিয়া। এমনকী বড় হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন যাদের লক্ষ লক্ষ ভক্ত রয়েছে, রাজ্যের প্রভাবশালী মহলে যাদের যথেষ্ট খাতির, তারাও নীরব থেকেছে। তখন এটা পশ্চিমবঙ্গ না বাংলাদেশ তা ভাবতে হয়েছে। সুতরাং কেন্দ্র (বা রাজ্য সরকার) যদি অনুপ্রবেশ বন্ধে এসব কাজ করতে শুরু করে তবে অনুপ্রবেশকারীদের মদতে রাজ্যের বিভিন্ন হিংসাত্মক কাজের উসকানি থাকবেই, সরকারি নজরদারদের উপর আক্রমণ ঘটবে, সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা দেওয়া হবেই। একমাত্র অনুপ্রবেশ বিরোধী তীব্র জন আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে একজোট করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার এটাই হবে শেষ ও নির্ণায়ক সংগ্রাম। পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলতেন, জিন্না ভারত ভাগ করেছেন, আমি পাকিস্তান ভাগ করেছি। এই সংগ্রামে পরাজিত হলে পশ্চিমবঙ্গ আবার পাকিস্তান হয়ে উঠবে।

—বর্তমান পত্রিকা, ১২ই সেপ্টেম্বর ২০১৪

অনুপ্রবেশকারী কারা ও কত?

আজ থেকে ২১ বছর আগে ১৯৯৩ সালে অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রথম বই লেখেন ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে— নাম 'প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ'। ১৯৯১'র জনগণনার ফলাফল তখন প্রকাশিত হচ্ছে। সেই পরিসংখ্যানেই ছিল পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা। অমলেন্দু দে'কে 'সাম্প্রদায়িক' বলে বিভূষিত করাটা কষ্টকর। অমলেন্দুবাবু আজীবন কমিউনিস্ট পার্টির একেবারে ঘরের লোক। তাঁর স্ত্রী শের-ই-বাংলা ফজলুল হকের পরিবারের মেয়ে। নিজে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ইসলামি ইতিহাসের শিক্ষক ও এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি। অমলেন্দু দে লিখেছেন— 'পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত জেলাগুলিতে যেভাবে বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং সেখানে যদি ধর্মীয় মৌলবাদীরা সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায়, তাহলে ভারতের সেকিউলার মডেলটি বিপর্যস্ত হতে পারে, এমন সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করার সত্যিই কোনও কারণ নেই।' এর বছর দশেক পরে সি পি এম মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ ফসকে স্বীকার করে ফেলেন যে সীমান্তের মাদ্রাসার বাড়াবাড়ি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ৬ মে, ১৯৯০-এ লোকসভায় জানান যে, ভারতে বেআইনি বাংলাদেশির সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। লোকসভায় এসব কথা বলে ফেলায় দারুণ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখান প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশের বন্যা শুরুর জন্য দায়ী আরেক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নিজেই সেই অনুপ্রবেশের ভয়াবহ চিত্র সি পি আই(এম)-এর মুখপাত্র গণশক্তির ১১ অক্টোবর, ১৯৯২ প্রকাশিত সংখ্যায় লিখেছেন—'১৯৭১ থেকে মুসলমানরাও ভারতে আসতে শুরু করল। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বি এস এফ ২.৩৫,৫২৯ জন বাংলাদেশিকে শনাক্ত করে ফিরিয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৬৮,৪৭২ জন হিন্দু আর ১,৬৪,১৩২ জন মুসলমান। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত মোবাইল টাস্ক ফোর্স ২,১৬,৯৮৫ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে বিতাড়িত করেছে। এদের মধ্যে ৫৬,৩৪২ জন হিন্দু ও ১,৬৯,৭৯৫ জন মুসলমান।' সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরকারি ভাষ্যেই ১৫ বছরে সাড়ে চার লক্ষ বাংলাদেশিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যার প্রায় ৭৫ শতাংশ মুসলমান।

১৫ বছর পরে ১৪ জুলাই, ২০০৪-এ আবার লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তরে কংগ্রেসের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সোয়াল জানালেন যে ভারতে মোট ১ কোটি

২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫০ জন বেআইনি বাংলাদেশি রয়েছেন। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আছে ৫৭ লক্ষ বেআইনি বাংলাদেশি। ব্যস, আবার শুরু হয়ে গেল 'সেকুলার'দের হইচই।

এবার আসা যাক অনুপ্রবেশকারী ও উদ্বাস্তু বা শরণার্থী নিয়ে বিভ্রম সৃষ্টির ব্যাপারটিতে। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু কারা, এটা সবাই জানান। তাঁদের শতাধিক কলোনি আছে। তাঁরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও পেয়েছেন। এঁরা কারা? সবাই জানেন এঁরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্যাতনের কারণে পালিয়ে আসা হিন্দু। এতে কেউ সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাননি। তাহলে ১৯৭২-এ বাংলাদেশ হওয়ার পর একই কারণে পালিয়ে আসা হিন্দুরা যে উদ্বাস্তু বলেই গণ্য হবেন, এ বুঝতে পণ্ডিত হতে হয় না। সমস্যাটা হচ্ছে যে ভারত সরকার গত ৪২ বছর ধরে এটা বুঝতে চাইছে না। ফলে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তর-পূর্ব ভারতে পরিচয়হীন জীবনযাপন করছেন। এই উদ্বাস্তুরা মূলত কৃষিজীবী তফসিলি সম্প্রদায়ের। দেশ ভাগের কারণে আগে এসে উদ্বাস্তু হওয়ার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কলোনির জমি পেয়ে, সরকারি চাকরি করে তিনতলা বাড়ি করে ফেলেন অনেকে। আর ১৯৭২-এর পর আসা মূলত মণ্ডল-বিশ্বাস-বৈরাগীরা কোনও সরকারি সাহায্য তো দূরের কথা, একেবারে পরিচয়হীন হয়ে অভাবের জীবনযাপন করছেন।

আরও পরিষ্কার করে উদ্বাস্তু ও বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের তফাতটা বুঝে নেওয়া যাক। ১৯৫১-এর রাষ্ট্রসংঘের কনভেনশনে যা ১৯৬৭'র প্রোটোকলে সংশোধিত হয়, তাতে উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে— 'যে ব্যক্তির জাতি, ধর্ম, নাগরিকত্ব বা কোনও সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্থার সভ্য হওয়ার জন্য নিপীড়িত হওয়ার যথেষ্ট উপযুক্ত আশঙ্কা রয়েছে বলে তার নাগরিকত্ব যে দেশের তার বাইরের দেশে রয়েছেন; অথবা এই ভীতির জন্য তাঁরা দেশের নিরাপত্তা নিতে আগ্রহী নন; অথবা এই সব কারণে নিজের দেশের বাইরে রয়েছেন এবং ফিরতে পারছেন না বা এই ভীতির জন্য ফিরতে ইচ্ছুক নন।'— মনে রাখতে হবে অর্থনৈতিক কারণে চলে আসা কাউকে রাষ্ট্রসংঘের সংজ্ঞায় উদ্বাস্তু গণ্য করা যায় না। ফলে অনুপ্রবেশকারী হচ্ছেন বাংলাদেশি মুসলমান, কারণ কেবল হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা আহমেদিয়ারা বা তসলিমা নাসরিন বা দাউদ হায়দারের (কবি) মতন নিপীড়িত মুসলমানরা উদ্বাস্তুর মর্যাদা পেতে পারেন।

এবার সংখ্যায় আসা যাক। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭১ পরবর্তী কত উদ্বাস্তু এসেছেন? পশ্চিমবঙ্গের সমাজবিদরা এসব নিয়ে গবেষণা করেন না কারণ তাহলেই ধর্মীয় প্রসঙ্গ চলে আসবে। কিন্তু এ নিয়ে বিশ্বখ্যাত গবেষণা করেছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ আবুল বরকত। আবুল বরকতসহ আরও দুই গবেষক Deprivation of

Hindu Minority in Bangladesh- Living wth Vested Property বইয়ে (পৃষ্ঠা ৬৬-৬৮, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৮) হিসাব করে বলেছেন যে ১৯৭১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে ৬৩ লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশ থেকে উধাও হয়ে গেছেন। যদি এর দুই-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গে এসে থাকেন, তবে পশ্চিমবঙ্গে নতুন উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২ লক্ষ। ২০১৪-তে সংখ্যাটা দাঁড়াবে ৫০ লক্ষের মতন।

২০০৪-এ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ জয়সোয়াল বলেছিলেন যে ভারতে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫০ জন বেআইনি বাংলাদেশি রয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আছে ৫৭ লক্ষ। এতে হিন্দু-মুসলমান সবাই আছেন। এগুলি সরকারি হিসাব— আসল সংখ্যা হবে এর কয়েকগুণ। জ্যোতিবাবুর সময়কার হিসাব ধরে একজন উদ্বাস্তু প্রতি তিনজন অনুপ্রবেশকারী ধরলে পশ্চিমবঙ্গে এখন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে প্রায় ১ কোটি।

অসমের অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত মামলায় ২০০৫-এর ১২ জুলাই-এর রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে— 'এই অবস্থায় এ নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে বহুসংখ্যক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা অসম রাজ্য এখন বাইরে থেকে আক্রমণ ও ভিতরে গণ্ডগোলে উৎপীড়িত।' এই একই কথা পশ্চিমবঙ্গের জন্যও সমান প্রযোজ্য।

পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যতের অনেকটাই নির্ভর করবে এই সমস্যা সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলি কীভাবে দেখবে, তার উপর।

— মোহিত রায়
বর্তমান, ১১ই মে ২০১৪



রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বর্তমান পত্রিকা গোষ্ঠীর সাময়িক পত্রিকা সাপ্তাহিক বর্তমানের সম্পাদক। দৈনিক বর্তমান কাগজের রাজনীতি কলমের নিয়মিত লেখক। তিন দশক ধরে নিরপেক্ষ ও নির্ভীক রাজনৈতিক সাংবাদিক রূপে বাংলা সংবাদ জগতে এক প্রতিষ্ঠিত নাম। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্যে নবতম সংযোজন ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে লেখা তাঁর গবেষণাধর্মী পুস্তক 'জ্বলিছে ধ্রুবতারা'।



মোহিত রায়

ছাত্র আন্দোলন ও আশির দশক থেকে মানবাধিকার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। গত এক দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের মানবাধিকারের দাবীতে প্রচার ও উদ্বাস্তু আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। পেশায় পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ ও আমন্ত্রিত অধ্যাপক। সংবাদপত্রে নিয়মিত লেখেন।